Bhārata-śilpa.
Calcutta, 1909
Pāñchu Ṭhākur. 3d ed.
Calcutta, 1909.
Tīrthayātrā-vivaraṇa.
Rajshahi, 1909.

Cat. No. 48
Reg. No. 251
373

ভারত শিল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

INDIA OFFICE
24 AUG 1911
LIBRARY
3003

Ben-Eng

V—BENGALI AND ENGLISH—ART.

18 Abanindra Nath Thakur—ভারত শিল্প। [Bhárat Silpa. Indian Art. A defence of the classical Indian art ideal as against the Western, and a plea for its revival in modern Indian art.] Pages 88, 4. Published by Manoranjan Banerji, 70, Colootolá Street, Calcutta. [5th September 1909.] 12°. 1st edition.

Price, 8 annas.

ভারত শিল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

INDIA OFFICE
24 AUG 1911
LIBRARY.

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিতবাদী লাইব্রেরী

৭০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
স্পষ্ট কথা	...	...	...	১
কি ও কেন ?	...	...	...	৭
পরিচয়	...	...	...	২০
মানস চর্চ্চা	...	...	...	৩৭
শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি	...	...	...	৪৭
শিল্পের ত্রিধারা	...	...	...	৬১
আর্ট ও আর্টিষ্ট	...	...	...	৮১

ভারতশিল্প

স্পষ্ট কথা

কথায় বলে,—'কুমাতা কখন নয়'। সন্তান সুরূপ হউক, কুরূপ হউক, নির্ব্বিচারে তাহাকে বুকে রাখিয়া পালন করা মাতার কাজ; আর দেশের শিল্প, দেশের সাহিত্য, যেমনই হউক তাহাদের সযত্নে ও সস্নেহে পোষণ ও রক্ষণ দেশের লোকের কাজ, এবং সেইটাই স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু যদি দেখা যায়, কোন রমণী তাহার কালো ছেলেটিকে পথের কাঙাল করিয়া প্রতিবেশিনীর সুন্দর ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন, তবে সেই রমণীকে প্রকৃতিস্থা বলিয়া লোকের ধারণা সহসা চলিয়া যায়; এবং মাতৃত্বের আদর্শে এই বিষম আঘাত মানবমাত্রকে ব্যথিত করিতে থাকে। তেমনি আজ যদি দেখি জগতের মধ্যে কোন এক জাতি তাহার নিজের শিল্প, নিজের সাহিত্যটাকে হেয় জ্ঞান করিতেছে, অর্থাৎ ঘোরো জল বাহির করিয়া বেনো জল ঘরে প্রবেশ করাইতেছে, তবে নিশ্চয়ই সে জাতির অধঃপতন সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই

থাকে না ; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার আদর্শটাও যে বিষম আঘাত পায় তাহা বলাই বাহুল্য।

বিচিত্রতাই যখন জগতের নিয়ম, তখন সেখানে স্বভাবের নিয়ম যে কখন কখন উল্টাইয়া যাইবে এবং সময়ে সময়ে মানবের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক জাতি একটা একটা বিপরীত কাণ্ড ঘটাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? এ মহা ঘোর কলিযুগে আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ একটা বিপরীত কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে এবং সেই অভিনয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে আমাদের বঙ্গবাসীরাই জগৎ-নাট্যশালার দর্শকের দৃষ্টি ও কৌতুক করতালি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেটা আর কিছু নয়, আমাদের কলা বৌটিকে লইয়া। ছেলেরা যে কালো বউ লইয়া ঘর করিবে তাহা আমাদের মনে ধরিতেছে না, আমরা মেম বৌ ঘরে আনিবার জন্য ব্যস্ত। আমাদের ঘরের কলালক্ষ্মী নিরপরাধিনী হিন্দুকন্যা কাজল পরিয়া সিন্দূর মাথায় দিয়া বিচিত্র বেনারসী সাড়ির আড়ালে থাকিয়া তাহার নূপুর কিঙ্কিণীর মৃদুগুঞ্জনে যে আমাদের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া অন্তঃপুরের শোভা ও সংসারের কল্যাণবর্দ্ধন করিতে থাকিবে ইহা আমাদের মনঃপুত নয়। আমরা চাহি এমন বৌ যাহাকে আমরা মেমসাহেব বলিয়া চালাইতে পারি।

হৃদ্‌পদ্মাসনা বরাভয়হস্তা দেবীমূর্ত্তি আমাদের মনে ধরিতেছে না। আমরা চাহিতেছি উষ্ট্রপক্ষীপঙ্খধারিণী,

গিল্টির ফ্রেমবাসিনী, কেদারা-আসীনা অর্দ্ধনগ্না আর-কাহাকেও যিনি আমাদের ঘর আলো করিয়া থাকিবেন। জাত্যাভিমান বলিয়া যদি কোন একটা পদার্থ থাকে তবে সেটা আমাদের মধ্যে কোন কালে ছিল, এই কাণ্ডের পর, একথা সহজে আর বিশ্বাস করিতে পারি না। আফ্রিকাবাসী অসভ্য,—যাহাদের নিজের কোন কলাকৌশল নাই তাহারা যদি এ কাণ্ডটা করিত তবে দোষ দিতে পারিতাম না। যাহার ঘরে জলের অভাব, সে যদি বাহিরের জল ঘরে আনে তবে তাহাকে বুদ্ধিমানই বলিতে হয়। কিন্তু আমরা নিজের শিল্পকলা বিসর্জ্জন দিয়া যে হৃদয়বিদারক ব্যঙ্গ কৌতুকের অভিনয়টায় যোগ দিয়াছি, তাহার লাঞ্ছনা আর কাহার স্কন্ধে চাপাইব?

আমাদের কলালক্ষ্মী আমাদের কোন্ অভাবটা অপূর্ণ রাখিয়াছিলেন? আমাদের রাজপ্রাসাদ, আমাদের দেবমন্দির; আমাদের থাকিবার গৃহ, পরিবার বসন, খাইবার বাসন, আরামের শয্যা, ঐশ্বর্য্যের আসবাব কোন্‌টা না তিনি পদ্মহস্তের স্পর্শে পবিত্র করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেবমন্দিরসকল পূজার উপযুক্ত, রাজপ্রাসাদ রাজার যোগ্য, ব্যবহারের জিনিষগুলা ব্যবহারের মত সুন্দর করিয়া কি তিনি গড়াইয়া যান নাই? তবে কোন্ দোষে আমরা তাঁহাকে এখনও নির্ব্বাসনে রাখিয়া দিব? চীন জাপান শিল্পরাজ্যে যে স্বর্ণপদ্মাঙ্কিত বিজয়

নিশান আজ উড়াইয়া দিয়াছে সে পদ্ম কাহার আসন ? —বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও যে আমাদের ভিক্ষুরা দেশে বিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ?

যে পথে তাতার সৈন্য ভারতবিজয়ে আসিয়াছিল, ঠিক সেই পথেই গ্রীক ও রোমক শিল্প একদিন প্রবলবেগে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। গান্ধারের পুণ্যক্ষেত্র সে ঘোর সঙ্কটের সাক্ষীভূমি। সেই দুঃসময়ে আমাদের এই নির্ব্বাসিতা কলালক্ষ্মী অভয়দাত্রীরূপে প্রকাশিতা হইয়া কি আমাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করেন নাই ? সে দিনের রণসাগর-মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছিল, তাহা তিনিই পান করিয়া আজও যে নীলকণ্ঠীরূপে বিরাজ করিতেছেন !

এদেশের সাধারণের, এমন কি যাঁহাদের আমরা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানি তাঁহাদেরও বিশ্বাস যে আমাদের শিল্পে Perspective বলিয়া একটা গুণ ছিল না ; এবং আমাদের শিল্প, আমাদের ঠিক মানুষটি—ঠিক রামবাবু শ্যামবাবুটি—গড়িয়া দিতে পারে নাই। Havell সাহেব তাঁহার Indian Sculpture and Painting নামক পুস্তকে এবং Lawrence Binyon তাঁহার Painting in the Far East নামক পুস্তকে এই ভুল বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। Les Characteristiques de la Peinture Japonaise প্রণেতা Binyon

সাহেব R. Petrucci সম্বন্ধে যে কয় ছত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই এ ভ্রম আমাদের অপনোদন হওয়া সম্ভব।

"He has conclusively shown that the mastery of perspective in Eastern painting is quite comparable to that of European painting; only it is different in the conventions it allows. Even in master-pieces of artists like Leonardo and Ingres the laws of perspective are boldly violated in obedience to aesthetic necessities.

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ন্যায় কলালক্ষ্মীর এই নির্ব্বাসন-কাণ্ডটা প্রাচ্যজাতি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বেশ খাপ খাইবার যোগ্য নয়। আমরা দেবী সরস্বতীকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি, আর তাঁহার ভগিনীটিকে ঘরের দাওয়া মাড়াইতে দিতে নারাজ কেন? কলালক্ষ্মীর হইয়া মোকদ্দমা চালাই এমন কড়ি আমার হাতে নাই, কিন্তু ভিক্ষা করিয়া দেবীর পূজা দিবার আশা রাখি; কেন না, আমাদের গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষুক কখন রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় না।

আজ কয়েক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রাচ্য শিল্পের চর্চ্চা করিয়া আমি একটি সত্য লাভ করিয়াছি। আমি

বুঝিয়াছি, যিনি আমাদের গৃহে ছিলেন, তিনি ছিলেন গেহিনী ও সখী ; তাঁহার স্থানে আমরা যাঁহাকে বসাইতে চাহি, তিনি গেহিনীও নয় সখীও নয় রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী ;—বড় লোকের ক্রীত দাসী !

বহুবার বহুবন্ধু আমাকে ভারত শিল্পটা কি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে আমার এই মাত্র নিবেদন যে পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার প্রত্যাশা বৃথা ! সূর্য্য যে কি পদার্থ তাহা দেখিতে পূর্ব্বমুখ হউন। যে শিল্প-সূর্য্য সমস্ত প্রাচ্যজগৎ সৌন্দর্য্য-কিরণে ডুবাইয়া পশ্চিম সাগরে একদিন অস্ত গিয়াছেন, আবার নিশ্চয়ই কোন সুপ্রভাতে তাঁহার দর্শন পাইবেন।

কি ও কেন ?

মাতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মদটা কি আর সে দ্রব্যটা তার পছন্দই বা হয় কেন, তবে মাতাল বেচারাকে বিষম গোলে ফেলা হয়। ভারতশিল্পের কি ও কেন লইয়া আমাকেও দু একবার এরূপ গোলে পড়িতে হইয়াছে। একবার আমার কোন বন্ধু তাঁহার মাসিক পত্রিকায় ভারতশিল্পটা কি পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমায় গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে বলেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আর একবার আমাদের এক দেশীয় নরপতি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—আমি দেশী ধরণে ছবি লিখি কেন ? সেবারে কিন্তু আমি "ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং" এই কবি-বাক্য স্মরণ করিয়া মৌন ছিলাম। উক্ত দুই কারণে বন্ধুবর এবং নরবর দুইজনের নিকটেই যে আমি অপরাধী হইয়াছি ;—অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও যে একটা-কিছু করা উচিত ছিল, একথা সকলেই বলিবে। শিল্প-বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ অথচ চট্ করিয়া ভারতশিল্পটা কি বুঝাইয়া দিতে একেবারে অক্ষম ;—দেশীয় ধরণে ছবি লিখিতেছি, অথচ কেন এরূপটা করি জিজ্ঞাসা করিলে জবাব নাই, ইহার অর্থ কি ? অর্থ কি একেবারেই নাই ?

বন্ধুর নিকটে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও মহারাজার আজ্ঞা-লঙ্ঘন এ দুটা গুরুপাপ ঘাড়ে লইবার যে কোন গুরুতর কারণ নাই তাহা কেমন করিয়া জানিলে ? কারণটা যদি শুনিতে চাহ তবে বলিতে রাজি আছি, কিন্তু মনে রাখিও এজন্য যদি আমার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে অথবা কোন উপদ্রব সহিতে হয় তবে সেজন্য তোমরা দায়ী।

আসল কথাটা এই, বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন ভারতশিল্পটা কি, তখন তাহার জবাব এই, তুমি না ভারতবাসী, ভারত-সন্তান, তোমাকে কিনা লিখিয়া বুঝাইতে বল ভারতশিল্পটা কি ? এ প্রশ্নটা যদি কোন সাহেব করিত, তবে তাহাকে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া, যুক্তির পর যুক্তি দেখাইয়া, প্রমাণের পর প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বুঝানর দরকার ছিল যে, ভারতশিল্পটা অশ্বডিম্বের মত একটা ভুয়ো জিনিষ নয়,—সেটা নিতান্ত ভারতবর্ষেরই,—যেমন তাহাদের দেশের শিল্প নিতান্ত তাহাদেরই। গুরুর আসনে বসিয়া সাহেবের চোখে কলমের ডগায় জ্ঞানাঞ্জন বুলাইয়া দিতে আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু তুমি নিজে ভারতবাসী হইয়া যদি আমার কাছে সে অঞ্জন চাহিতে এস, তবে আমি এই সন্দেহ করি যে, হয় আমার বুদ্ধির দৌড়টা পরীক্ষা করিবার তোমার কুমৎলব আছে, নয়তো তুমি চক্ষের মস্তকটি একেবারে খাইয়া বসিয়াছ ;—নির্ব্বাণ দীপে তৈল দানের ন্যায় তোমার চোখে অঞ্জন দিয়া কোন্ ফল !

সেকালের প্রসিদ্ধ বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর নাম শুনিয়াছ। শেষ দশায় তিনি আমাদের বাড়িতে সদা-সর্ব্বদাই আসাযাওয়া করিতেন,—আমার পিতামহের সঙ্গে তাঁহার বড়ই সখ্য ছিল। এক সময়ে জয়চাঁদ বাবুর জমিদারী হইতে এক কলসী পদ্মমধু আসিয়াছিল। জয়চাঁদবাবু মধুর কলসটি লইয়া আমাদের বাড়িতে উপস্থিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাড়ির ডাক্তার ডি গুপ্তও সেখানে হাজির। পদ্মের মধু চক্ষু-রোগের মহৌষধ, সহজে দুর্ল্লভ ;—সেই পদার্থ এক কলসী হাজির! ডাক্তার বাবু এক ভাঁড় মধুর জন্য দরখাস্ত পেশ করিলেন। জয়চাঁদ-বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"বটে? আমার এত কষ্টের মধুটুকু রাজ্যের কাণার চোখে দিয়া নষ্ট করিবে? সে হইবে না, এ মধুতে রসগোল্লা পাকাইয়া খাওয়াই ভাল।" জয়চাঁদবাবুর কথাও যা কাজেও তা। তৎক্ষণাৎ সেই অমূল্য মধুর অপূর্ব্ব রসগোল্লা প্রস্তুত হইয়া বাড়ির ছেলেপিলে এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ হইয়া গেল। আমিও তাই বলি হে বন্ধুবর, আমার ঘটে যেটুকু আছে সেটুকু আমি কাণার চোখ ফোটান কাজে লাগাইতে রাজি নই, সেটুকু দিয়া আমি রসগোল্লা পাকাইয়া তোমাদের দিতে চাই, এখন বুঝিলে কি?

রসগোল্লাটা কি পদার্থ নিজে চাখিয়া বুঝিতে হয়; তেমনি ভারতশিল্পটা কি যদি জানিতে চাহ, তবে এই

লও একখানা দেশী ছবি, একটা পাথরের মূর্ত্তি, একখানা কাশ্মিরী শাল, বেনারসী শাড়ী ; ঐ তোমার সম্মুখে একটা মন্দির, ঐ একটা মস্‌জীদ, একটা পুরাতন রাজবাড়ি ; এই কতকগুলা ছেলেদের খেলনা, গৃহস্থালির তৈজস, বাবুগিরির আসবাব ; আরও তোমার সম্মুখে বিস্তৃত আকাশ, কানন, নদনদী, পাহাড়পর্ব্বত-শোভিত ভারত-ভূমি ; পার্শ্বে তোমার কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, পুরাণ, বেদ বেদান্ত আর ভারতের লক্ষ কোটী নরনারী, ইহাদের দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, পড়িয়া অর্থাৎ কিনা রসগোল্লাটার মতন চাখিয়া নিজেই বোঝ ভারতশিল্পটা কি। আমাকে বৃথা জ্বালাতন করিও না। ইহাতে যদি মন না ওঠে তবে কোন কেমিক্যাল-একজ্যামিনার সাহেবের কাছে যাও, সে লোকটা জন্মে রসগোল্লা চাখে নাই অথচ তোমায় বেশ বুঝাইয়া দিবে, রসগোল্লাটা কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি।

আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি ভাবিলে আমি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মটা তোমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া সরিয়া পড়িলাম এবং ইহার পরে সাহেবদের কাছেই ভারতশিল্পটার রাসায়নিক ব্যাখ্যা শুনিতে যাইবে ;—কেননা তোমার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি নিজেই কাণা ; অতএব কাণা তোমাকে পথ দেখাইতে সাহস পাইতেছে না। এইরূপই যদি হয় তবে ভাই তোমায় সাবধান করিতেছি যে,

পরের মুখে ঝালই হোক বা মিষ্টিই হোক খাইতে চলিও না ; নিজে চাখ, নিজে বোঝ। আমিও তোমার মত একদিন ইউরোপ হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি বই কিনিয়া ভারতশিল্পটা কি বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, তোমারও যদি সেই মৎলব থাকে তবে অনুরোধ করি পয়সাগুলার অপব্যয় করিও না ;—আমার লাইব্রেরিটা তোমায় ধার দিতে রাজি আছি পড়িয়া লইও। আর চাও, আমিই তোমায় বলিয়া দিতে পারি ইউরোপিয়ান্ গুরু তোমায় ভারতশিল্পের কত রকম ব্যাখ্যা দিবে। মনে রাখিও সেখানেও তুমি এক মত, এক ব্যাখ্যা পাইবে না। নানা মুনির নানা মতের ফেরে, এখানেও যেমন, সেখানেও তোমায় পড়িতে হইবে। তাহার মধ্যে দুইটা দলের কবলে না পড়, সেজন্য তোমায় কিঞ্চিৎ সাবধান করিতেছি। প্রথম দলটা গোঁড়ার দল। রস্কিন্ প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিত ও ইউরোপের পনেরো আনা লোক এই দলে। ইহাদের মতে গ্রীক আর্টই আর্ট, কৃশ্চান আর্টও তথৈব ; আর এই যে দেখ ভারত, ইজিপ্ত, পারস্য, আরব, এ সকলই বর্ব্বর ও অপকৃষ্ট শিল্প। এই দলের মহারথীগণ গ্রীক শিল্পের মাধুর্য্য, তুলনা দিয়া দেখাইবার সময় বর্ব্বর শিল্পের আদর্শ নিজের দেশে খুঁজিয়া পান না, খুঁজিতে আসেন আমাদের দেশে। ইহাদের কাছে আমাদের দেবমূর্ত্তি সকল রাক্ষস মূর্ত্তি, মন্দিরগুলা ভূষণ-ভার-গ্রস্ত বর্ব্বরতার স্তূপমাত্র।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে ইহাদের কাছে বড় একটা কিছু আশা করিও না; তবে গ্রীক্-শিল্প ও কৃশ্চান্-শিল্প সম্বন্ধে এই দলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে উপদেশ লইতে পার।

দ্বিতীয় দলটা প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ববিদের দল,—ইহারা তোমাকে ভারতশিল্পের প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বটা যতক্ষণ বুঝাইবে, বেশ বুঝাইবে; কিন্তু ভারতশিল্পের রসটুকু ব্যাখ্যা করিবার সাধ্য ইহাদের নাই; উপরন্তু ইহারাও প্রথম দলের ন্যায় গ্রীক্ ভক্ত, ও তোমাকে প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে ভারতশিল্পের যা কিছু সুন্দর সেটা গ্রীক-দিগেরই দান, কেন না গ্রীক্ সম্রাট আলেকজান্দার মাস কতকের জন্য, আর তাঁহার অনুচরেরা বছর কতকের জন্য, পাঞ্জাব অঞ্চলে বাসা বাঁধিয়া ছিলেন। এই গ্রীকৃতত্ত্বটা প্রত্ন ও পুরাতত্ত্বের সঙ্গে এমন জট পাকাইয়া ইহারা তোমার সম্মুখে ধরিবে যে, সে জট খোলে কাহার সাধ্য!—নাগ-পাশের মত তোমায় কাবু করিয়া ফেলিবে।

এ ছাড়া আর একটা দল;—দল বলা যায় না, কেননা এ দলের লোক দু চারি জনের বেশি ইউরোপে দেখিতে পাই না,—সে লোকগুলি বাস্তবিক আমাদের শিল্পটাকে প্রাণ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এ দলের কাহারো হাতে যদি তুমি পড়, তবে দেখিবে সে তোমার-আমার মত, রসগোল্লা কি, নিজে চাখিয়া বুঝিতে বলিবে। এবং এ কথাও বলিবে যে তুমি ভারতবাসী, তুমি চেষ্টা করিয়া পরখ

করিলে তাহা হইতে যে রস পাইবে ও দ্রব্যটাকে যেমন করিয়া বুঝিবে, আমি বিদেশী কখনই তেমনটা পারিব না। "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" ও "কষ্ট নহিলে কেষ্ট মিলে না" এই দুটিমাত্র উপদেশ দিয়া সে লোক তোমায় ছাড়িয়া দিবে। জিজ্ঞাসা করি, তখন কি বন্ধু বুঝিবে, ঠেকিয়া শেখা ছাড়া এক্ষেত্রে তোমার উপায় নাই?

কংস জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া উদ্ধার হইয়া গেল,—কৃষ্ণদায়ে ঠেকিয়াছিল বলিয়া। তেমনি আমিও বন্ধু, তোমরা শিল্প-দায়ে ঠেকিয়াছ, দেখিতে চাই;—তবেই আমাদের কলালক্ষ্মী বিশ্বরূপিণী হইয়া তোমাদের দেখা দিবেন। হরিনাম ছাড়া যেমন 'কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা', আমি বলি তেমনি "কলায়াং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ঠেকিয়া শেখা ছাড়া।

এখানে আমাদের রাজেন্দ্রবর্গ কি বলেন শোনা যাক্। বলিয়া রাখি, এ জীবগুলি আমাদের সে কালের রাজাদের মত নয়,—ইঁহারা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের ছাঁচে-ঢালা কাটা-ছাঁটা ফিট্‌ফাট্ রাজা, ইঁহারা আতর গোলাপ গায়ে মাখেন না, ইঁহাদের জন্য প্যারিস হইতে "রি-গোর" এসেন্স চালান আসে। মণিমাণিক্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদে বাস করিলে ইঁহাদের "হেলথ্" খারাপ হয়, অতএব ইঁহারা ইয়োরোপ হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া ফ্রেঞ্চধরণে সাটু বানাইয়া সেটাকে কট্‌গ্লাস মণ্ডিত করিয়া তাহাতে সুস্থ শরীরে বাস করেন, এবং তীর্থযাত্রার বদলে বছরে একবার বিলাতে সফর করেন সমহিষী।

এই রাজ্যাভিষিক্ত ভারতবাসী অপূর্ব্ব জীবগুলি যখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন—ফ্রেঞ্চ ধরণ, ইতালী ধরণ, ইংলিস, জর্ম্মাণ, রাসিয়ান, এত ধরণ থাকিতে তুমি দেশী ধরণে ছবি লেখ কেন, তখন আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—রাজন্! আমি যে দেশী ধরণে ছবি লিখি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়, না মহারাজ যে আতরগোলাপ ছাড়িয়া বিলাতি এসেন্স, রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া ফ্রেঞ্চ 'সাটু', ও কাশীধাম ছাড়িয়া বার্ম্মিংহামে মজিয়াছেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়?

কাছিম একবার আকাশমার্গে উড়িতে চাহিয়াছিল; এবং রাজন্, জাহাজ ভাড়া করিয়া আমরা যেমন বিলাতে যাই, তেমনি কাছিম বেচারা অনেক কষ্টে একটা ঈগল পক্ষী ভাড়া করিয়া ও তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া আকাশমুখে চম্পট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। জাহাজ যেমন আমাদের ঠিক ২১ দিনে বিলাত পৌঁছাইয়া দেয়, পক্ষিবাহনও কাছিম ভায়াকে ঠিক নিয়মিত সময়ে বন্দরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কাছিম বন্দর হইতে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল বটে,—কিন্তু সাফ্ কাছিমত্ব হারাইয়া! অতএব হে মহারাজ, বলুন দেখি, এই যে আমি যেখানকার সেখানে থাকিয়া সুখে মরিতে চাহিতেছি ইহাতে আপনার ক্ষোভের কারণটা কি থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণের ছেলেকে হোটেলে খাইতে দেখিতেছ, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে না, আর দেবমন্দিরে প্রসাদ কুড়াইতেছি ইহাতেই অমনি প্রশ্ন তুলিলে? আমি

কেন এরূপটা করিতেছি জানিতে চাহিতেছ? সে অনেক দুঃখের কথা। ভাবমরীচিকা ধরিবার আশায় তোমার ও ফ্রেঞ্চ, ইতালী আরও কত কি, পথে ছুটিয়াছি; এককালে কাছিমের মত জাহাজ ভাড়া করিবারও মৎলব আঁটিয়াছি, কোন ফল পাই নাই। এখন দেখিতেছি, এই পথে গেলে সে মায়াবিনী যদি ধরা দেয়!

মহারাজ! দেখিতেছি, আমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমার মনে আমার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিতেছে এবং এই পাগলের পাল্লা হইতে সরিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতেছ। তা হইবে না মহারাজ, আমাকে ক্ষেপাইয়াছ তখন আর একটা শ্লোক না শুনাইয়া ছাড়িতেছি না।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

মহারাজ, তোমার স্বধর্ম্ম যেমন প্রজাপালন ও রক্ষণ তেমনি আমি শিল্পী আমারও স্বধর্ম্ম হচ্ছে যে আমার নিজত্ব, অর্থাৎ আমি যে ভারতীয় চিত্রকর আর কেহ নই সেইটুকু, বজায় রাখা; আর নিজের শিল্প যাহাতে লোপ না পায় তাহার চেষ্টা করা। মহারাজ, একবার একটা ফ্রেঞ্চম্যান—ফ্রেঞ্চম্যানের নাম শুনিয়া মহারাজের যে হাসি ধরে না—একবার একটা ফ্রেঞ্চ কাউণ্ট কি কি-একটা আমার এই লক্ষ্মীর ঘরের আল্‌পনাগুলা দেখিতে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, আমি ফ্রান্সে যাইতে ইচ্ছা রাখি কি না? আমি বলিলাম, ফ্রান্সে যাইয়া কি লাভ? বাঙালীর ছেলে অথচ ফ্রান্সে যাইতে নারাজ! কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে লোকটার কিছুক্ষণ গেল; কিন্তু যখন আমার কথার প্রকৃত অর্থটা বুঝিতে পারিল তখন সে আমার চারিদিকে নাচিয়া কুঁদিয়া আমার সঙ্গে হস্তকম্পন করিয়া এমন একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, আমার ভয় হইল, বুঝিবা ধরিয়া আমার মুখচুম্বন করে! কিন্তু লোকটা ছিল ভবঘুরে, আমি তার নামটা টুকিয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম, নচেৎ মহারাজকে তাহার ঠিক ঠিকানা দিতে পারিতাম;—কাজেই লোকটা যাইবার সময় আধ আধ ভাষায় যে শ্লোকটা আওড়াইয়া গিয়াছিল তাহাই উপহার দিতেছি—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

মহারাজ, বুঝিলেন কি সকলে যখন জাত হারাইয়া ন্যেড়া বনিয়া বাহির হইয়াছে তখন কেন আমি এই ভাঙা মন্দিরটায় ধন্না দিয়া পড়িয়া পড়িয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে আল্‌পনা টানিতেছি? সবাই যদি সরিয়া পড়ি তবে কলাদেবীর পূজা হয় কেমন করিয়া, আর যদি কোন অতিথি এ মন্দিরে আসে তবে তার সৎকারইবা করে কে?

রাজন্, মনে মনে হাসিতেছ? ভাবিতেছ যে,কোথা হইতে একটা ছেলেখেলার পুতুলকে ঠাকুর বলিয়া খাড়া করিয়া স্বপ্নে সাম্রাজ্য লাভের ন্যায় নিজেকে একটা মোহান্ত-গোছের-

কিছু মনে করিতেছি; আমি যেটাকে কলালক্ষ্মী বলিয়া পূজা দিতেছি সেটা আসলে দেবীমূর্ত্তিই নয়, শিল্প-হাটে সেটা একটা কালীঘাটের পুতুল কিম্বা পট-গোছের কিছু। ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে গ্রীস রোম ইটালী প্রভৃতি শিল্পের সপ্তলোকবাসী তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোন এককে না পাকড়াইয়া এই খেলার পুতুলটাকে ভোগ লাগাইতেছি ইহাতেই মহারাজ আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং ইহাতেই মহারাজ আঁচিয়াছেন যে আমার মহান্তগিরির কুমৎলব আছে। বলি মহারাজ! আপনি এটা কি বুঝিতেছেন না যে, আমি যে কলাদেবীর পূজায় লাগিয়াছি তাঁর যদি কোন দেবোত্তর সম্পত্তি থাকিত তবে মোহান্তগিরির লোভটা সামলাইতে না পারিবারই কথা। যে সময়ে দেশের রাজামহারাজার উপরে কলালক্ষ্মী বরাতি চিঠি দিবার ক্ষমতা রাখিতেন, সে সময়ে মোহান্তগিরির কথাটা মনে উদয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু মহারাজ আপনারা কলালক্ষ্মীর খাতক হইয়াও যখন গণেশ উল্টাইয়া বসিয়া আছেন, তখন এ মোহান্তগিরিতে কেন লোভ হইবে? ভয় নাই মহারাজ, খাতক বলিয়া আমি আপনাকে আদালতে হাজির করিতে চাহিতেছি না; কিন্তু মহারাজ, আমি যে মোহান্ত হইতে চাই এ কথাও আপনি কখন মুখে আনিবেন না;—কোন্ দিকে কে শুনিয়া ফেলিবে আর স্বরাজের মত স্বধর্ম্ম ও স্বশিল্প গোছের একটা অকাণ্ড বাধাইয়া একজন

লিডার হইতে চাহিতেছি বলিয়া আমাকে লইয়া টানাটানি পড়িবে।

দেখুন মহারাজ, আপনাকে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আপনি যে আমার দেবীটিকে পুতুল আর পটের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন এটা বড় ভাল হইতেছে না। আপনি কি জানেন না, একদিন এই দেবীর পূজা দিতে মোগল বাদশারা রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিয়াছিল? জানেন না কি, এই দেবীরই সিংহাসন ছিল জগৎবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন?— আর সেটা লইয়া কি কাণ্ডই না হইয়া গেছে! মহারাজ এখনো যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর লোকে, ব্যবসাদার বল, সৌখিন ভ্রমণকারীই বল, গতিবিধি করিতেছে,সেকি তোমার ওই ফ্রেঞ্চ 'সাটু' দেখিতে, না তোমার কাট্-গ্লাসের সন্ধান করিতে?

মহারাজ, তুমি বল কিনা আমার দেবী মাটির ঢেলা, পটের চিত্র! তবে মহারাজ, কার প্রসাদে ভারতবাসী এতকাল দুর্ভিক্ষের মুখ দেখে নাই; আর কাকে অপমান করিয়াই বা সেই ভারতবাসী আজ উপবাসে প্রাণ দিতেছে। এখনও বুঝিতেছ না আমি কার দ্বারে ধন্না দিতেছি? কেনই বা? মহারাজ, তোমরা কার সন্ধানে পশ্চিম সাগরে পাড়ি জমাইয়াছ তাহা তোমরাই জান, কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, মরিব তবু নড়িব না;—এজন্মে না হোক পরজন্মেও দেবীর দর্শন লাভ করিব।

দেখ, এই নির্জ্জন মন্দিরে একলা বসিয়া বড় চমৎকার একটা রহস্য দেখিতে পাই—কালচক্র নিয়তই সূর্য্যটাকে পশ্চিম মুখে টানিয়া লইতেছে ; পূর্ব্বদিকটা অন্ধকার করিয়া সূর্য্য যখন চলিয়া যায়, আমি ভাবি, যাঃ গেল, আর আসিবে না ; কিন্তু দেখি পরদিন পূবের সূর্য্য পূবেই হাজির হইয়া আবার দেশে স্বর্ণবৃষ্টি সুরু করিয়াছে। তেমনি মহারাজ, যে কালচক্র আজ তোমাদের পশ্চিম দিকে লইয়া চলিল সেই আবার তোমাদের পূবে আনিয়া পৌঁছিয়া দিবে ও আমি দেখিব তোমাদের করপুট স্বর্ণপদ্মের মত আমার এ মন্দিরে কলালক্ষ্মীর অর্চ্চনায় লাগিয়া গেছে, আমি সেই সুপ্রভাতের আশায় রহিলাম, মহারাজ !

পরিচয়

ভারতবাসীর কাছে ভারতশিল্পের পরিচয় চেনা বামুনের পৈতার মতন নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু কালের গতিকে তাহারও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বিশেষ করিয়া।

সেদিন যখন সাহিত্য পরিষদে হ্যাভেল সাহেবকে ভারত-শিল্পের আদর বর্দ্ধনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া অভিনন্দন পত্র দিবার প্রস্তাব হয়, শুনিয়াছি কেহ নাকি সেই সময়ে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন,—ভারতশিল্পটা এমন কি অপূর্ব্ব পদার্থ? ইউরোপীয় শিল্প যেমন আমাদের হুবহু মানুষটা কিম্বা জানোয়ার অথবা গাছ-পালাটা আঁকিয়া ও গড়িয়া দেয়, ভারতশিল্পটা কোনকালে তেমনটা পারিয়াছে কি? তবে কিসের জন্য আমরা সুসভ্য পাশ্চাত্য শিল্পটাকে ছাড়িয়া তাহার আদর করিব, আর সেই কারণে কেনই বা কাহাকেও ধন্যবাদ দিতে যাইব? হ্যাভেল সাহেবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কতকটা "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" গোছের বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু আমাদের নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটি বড় সিধে বলিয়া বোধ হয় না। যখন আমরা দেখি নিজের শিল্পে বীতশ্রদ্ধ, পরশিল্পলুব্ধ ব্যক্তিটা বড় একটা যে-কেহ নন,

ইহার মতের সমর্থন করিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ 'কেহ'ই অগ্রসর, তখন তো আর চুপ থাকিলে চলে না। একের বিপক্ষে মৌন থাকা ভদ্রতার লক্ষণ বটে, কিন্তু অনেকের বিপক্ষে চুপ করিয়া গেলে মৌনটা যে সম্মতি হইয়া পড়ে, তার উপায় কি? কাজেই লোক বুঝাইবার জন্য না হউক, নিজের মন বুঝাইবার জন্যও প্রশ্নটা লইয়া নাড়া চাড়া করা চাই।

শুনিয়াছি, নেপাল রাজদরবারে ঠিক শাস্ত্রসম্মত ছবি না আঁকিয়া যদি নূতন রকম—অর্থাৎ দেশী না হইয়া বিলাতী ধরণ—ছবি কেহ আঁকে তবে তাহাকে ধরিয়া জেল দেয়। আমার পরশিল্পলুব্ধ দেশভ্রাতাগণের জন্য সে ব্যবস্থা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু এই প্রস্তাব লইয়া আমি যারি কাছে যাইব সেই তো আগে আমাকে ধরিয়া তালা বন্ধ করিবে।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, 'Look before you leap'. যেখানটায় নির্ভর করিয়া জীবলীলা যাপন করিতেছ সেটা ছাড়িয়া অপরিচিত কোন-একটা-কিছুর দিকে লাফ দেওয়াটা ঠিক নয়। যেটা ধরিতে যাইতেছি সেটা এত লোভনীয় কিনা যার জন্য সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাটাও তুচ্ছ করিতে পারি, দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের নিজের যে শিল্পটা আমাদের জীবনযাত্রার চারিদিক দিয়া চিরদিন আমাদের মন হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, ধর্ম্ম আমাদের যে শিল্পকে সহায় করিয়া দেশে বিদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে,

আমাদের জীবনের অনেকখানি সুখ, অনেকখানি গৌরব যেটার উপরে অনেকটা নির্ভর করিতেছে, সেটাকে ছাড়িয়া পশ্চিমসাগরপারে কোন একটা অনিশ্চিত চকচকে পদার্থকে হঠাৎ ধরিতে যাওয়ায় বিপদ তো নিশ্চিতই আছে, উপরন্তু সে বিপদে কেহ যে আমাদের জন্য আহা উহু করিবে এমন আশাও খুব কম। ঐশ্বর্য্যকে বিষ জানিয়া যে গৃহস্থ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি সাধ করিয়া পথের কাঙাল হইলেন বলিয়া কেহ তো দোষ দেয় না, উল্টা বরং তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আমরা ধন্য হইয়া থাকি। আর যে মূর্খ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অপব্যয়ে অর্থ উড়াইয়া পরিবারে অনর্থ ঘটাইয়া পথের কাঙ্গাল, লোকে কবে তাহাকে ভাল বলিয়া পূজা দিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, এই যে বাঙ্গালী আমরা মোটে দেড়শত কি দুইশত বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া বৎসর ত্রিশেক মাত্র পাশ্চাত্য শিল্পকলায় অপরিপক্ক শিক্ষা বা শিক্ষার ভাণ মাত্র লাভ করিয়া, perspective, light, shade এইরূপ দুই চারিটা বিলাতি বুলি কপচাইতে কপচাইতে বুড়া বিশ্বকর্ম্মার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া পশ্চিম আকাশে চক্‌চকে পদার্থটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি,সেটা কি কতকটা not looking before leaping গোছের কাজ করা হইতেছে না? সাধ করিয়া বাস্তু ভিটা কেহ ছাড়ে না, যদি বা নূতন বাড়িতে উঠিবার

প্রয়োজন হয়, তবু পাঁজিপুঁথি দেখিয়া কালাকালের জন্য অপেক্ষা করিয়া নূতন বাড়িটাকে যতটা সম্ভব পুরাতন বাড়িটার মত আরামের এবং বাসোপযোগী করিয়া তবে অন্যত্র উঠিয়া যাই। সেইরূপ দেশী শিল্পটাকে ছাড়িবার বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন?

শুনিয়া খাওয়াতে আর চাখিয়া খাওয়াতে অনেক তফাৎ। রসগোল্লাটা চাখিয়া দেখিলে তবে বোঝা যায় সন্দেশ অপেক্ষা রসগোল্লাটা কত মিষ্ট, আবার সন্দেশটাও চাখিয়া দেখিতে হয়, নচেৎ কেমন করিয়া বুঝিব সন্দেশ মিষ্ট কি গোল্লাটা মিষ্ট। অতএব দেখিতেছি আমাদের এই শিল্প-বিসর্জ্জন ব্যাপারে পুরাতনটাকে ছাড়িতে গেলেও যে গোল, নূতনটাকে ধরিতে গেলেও সেই গোল। আমরা কালাকে ছাড়িয়া গোরাকে ধরিতে গেলে সে বলিবে,—তুমি আগে কালার সহিত বেশ করিয়া পরিচয় করিয়া এস তবে তো বুঝিবে গোরার কত গুণ; আবার কালার পক্ষ হইতে ঐ একই ভাবের কথা আমাদের শুনিতে হইবে—গোরাটা কতটা মিষ্ট তা না জানিলে আমি অধিকতর মিষ্ট কি না বুঝিবে কেমন করিয়া? এ যে দেখি বিষম বিপদ—রামের হাতেও মার, রাবণের হাতেও মার! উপায় কি? উপায় আছে বইকি। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' করিয়া নিজের শিল্পে ভিড়িয়া পড়া, অথবা বহ্নিমুখ পতঙ্গবৎ নূতন আগুনে আমার মত একবার জ্বালা সহিয়া আগুনটা কেমন লোভনীয় জানিয়া ফিরিয়া

আসা। প্রথম উপায়টা সহজ; তাহাতে অনেক ল্যাঠা চুকিয়া যায়,—হত্যা দিয়া চরণে পড়িয়া থাকার মত। এ উপায়ে রসগোল্লাটা সন্দেশের চেয়ে বেশি মিষ্ট কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু সেটা যে মিষ্ট সেটুকু বেশ বোধ হয়। কিন্তু এই উপায়ের দোষও আছে—সন্দেশটা না জানি কেমন এইরূপ একটা লালসা মনে থাকিয়া যায় এবং সুযোগ পাইলে সন্দেশের হাঁড়ির দিকে হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করে; কাজেই নিজের শিল্পে আত্মসমর্পণ কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ দ্বিতীয় উপায়টিতে অনেক জ্বালা সত্য, কিন্তু তাহাতে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা আর জীবনে ভুলিবার নয়;—ঘরপোড়া গরুর মত পোড়া মন পশ্চিমের সিন্দূরবরণ দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠে। গভীরতর দুঃখ পাইলে তবে জীবনের আনন্দ নিবিড়তর করিয়া বোঝা যায়। শিল্পে এই পতঙ্গবৃত্তি আমাদের সঙ্গে আমাদের শিল্পের যে বন্ধন ঘটাইয়া দেয় তাহা অটুট;—কাটাও যায় না, কাটিতে ইচ্ছাও হয় না। এ অবস্থাটা যেন কতকটা, পাশা খেলার পাকা ঘুঁটির মত সব ঘর হইয়া নিজের কোটে আসিয়া বসা। তবেই দেখা গেল, শিল্পবিষয়ে আর সকলের মত আমাদেরও অনন্তগতি অর্থাৎ আমরা যেদিকেই যাইতে চাহিনা কেন, নিজের শিল্পচর্চ্চা না করিয়া আমাদের নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। নদীর গতি নূতন নূতন দেশের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু সেই চিরপুরাতন নির্ঝরের

সহিত যোগ রাখিয়া ; পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেই তাহার মরণ নিশ্চয়। শিল্পের গতিও সেইরূপ ; পুরাতনকে ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ। আবার দেখা যায়, নূতনের দিকে,—সম্মুখের দিকে নদীর যে স্বাভাবিক গতি তাহা যদি অবরুদ্ধ করিয়া তাহাকে উজান বহাইবার চেষ্টায় থাকা যায়, তবে নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া তাহাতে আবর্জ্জনা ও চড়া পড়িতে থাকে এবং শেষে নদী একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়।

পুরাতনের সহিত নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিলে আমাদের যে দশা নূতনের দিকে না যাইলেও সেই দশা।

যে দেশে যখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তখনই সেখানকার শিল্পে জড়তা ও মৃত্যু আসিয়া উদয় হইয়াছে।

এক কথায় শিল্পেতে হউক, সভ্যতাতে হউক যেদিন হইতে আমরা adopt করিতে শিখি কিন্তু adapt করিয়া লইতে ভুলি, সেই দিন হইতে আমাদের সভ্যতা ও শিল্প দুইয়েরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। আমরা যখন কোন একটা শিল্পের উপযোগিতা অনুপযোগিতা গণ্য না করিয়া নির্ব্বিচারে সেটাকে গ্রহণ করি তখন বলিতে হইবে আমরা সেটা adopt করিলাম। আর যখন সেটাকে ভাঙিয়াচুরিয়া গড়িয়াপিটিয়া মনের মত, নিজের মত করিয়া লই তখন জানিতে হইবে আমরা সেটা adapt করিয়া লইলাম।

Adopting কতকটা যেন চাকরী করিতে বাসা-বাড়িতে থাকা বা বাঙ্গালীর সাহেবী সাজ করার মত। দেহ, মন,

উপযোগিতা, অনুপযোগিতার কথাই নাই, যেমনটি পাইলাম তেমনিটি লইলাম। আর যেখানে adapting সেইখানেই 'আমার' কথাটি আসিয়া পড়ে ;—আমার বাড়ি, আমার সাজ, আমার শিল্প।

মানব-শরীরের পরিপাক-শক্তি যেমন, শিল্পের পক্ষে adapting শক্তিটাও সেইরূপ। দুইটা শক্তির বলেই বাহির হইতে যেটাকে গ্রহণ করা হয় সেটাকে নিজের করিয়া দেয়। শরীর যেমন ভুক্ত দ্রব্যটাকে শোণিতে পরিণত করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, শিল্পও তেমনি বাহির হইতে যখন যেটা গ্রহণ করে, সেটাকে নিজের করিয়া লইয়া নিজের ভিতরে অমৃতরূপে সঞ্চালিত করিতে থাকে ; এবং একমাত্র এই উপায়ে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই adapting ব্যাপারটা আমাদের শিল্পে পুরাকালে কিরূপ কাজ করিয়াছিল এবং একালেই বা কিরূপ কাজ করিতেছে দেখা যাক। একালে আমরা adapting ব্যাপার কিভাবে চালাইতেছি তাহা দেখিবার জন্য আমাদের বেশিদূর যাইতে হইবে না ; আমাদের পয়সাওয়ালাদের ঘরবাড়ি ও আমাদের সংসারযাত্রার আসবাবগুলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই চলিবে। কিন্তু পুরাকালে এই শক্তি আমাদের শিল্পে কিরূপ কাজ করিতেছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন Asiatic Artটার চর্চ্চা করিতে হইবে অর্থাৎ তুরস্ক হইতে জাপান, একদিকে চীন তাতারের

উত্তরসীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাসাগর—এই বিরাট ভূখণ্ডের খণ্ড শিল্পগুলার ক্রমচর্চ্চা আবশ্যক ; পরে বৌদ্ধযুগে যে মহাশিল্প এই খণ্ড শিল্পগুলাকে নিজতেজে অনুপ্রাণিত করিয়া এক অখণ্ড অম্লান Asiatic Art রূপে প্রকাশ করিয়া গেছে সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা চাই। বৌদ্ধযুগের ভারতশিল্পের বিরাট স্রোতের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতশিল্পও নানাদেশে নানা শিল্পের মধ্য দিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে! চীনে যাই, জাপানে চলি, তুরস্কের মরু-প্রান্তরেই বা সন্ধানে ফিরি, সর্ব্বত্রই দেখি সেই শিল্প যে শিল্প আমাদের বরহাট-স্তূপ ভাস্কর্য্যে মণ্ডিত, অজন্তা গুহা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছে। সে যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই নিজের ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সেই দেশের শিল্পটাকে লোপ না করিয়া। আমি বলি এইখানেই ভারতশিল্পের মহত্ত্ব। রাজার যেমন মহত্ত্ব প্রজার উচ্ছেদ সাধন না করিয়া প্রভাব বিস্তার করা ; নদীর যেমন মহত্ত্ব শখানদীগুলিকে শোষণ না করিয়া নিজের স্রোত পূর্ণ করা ; তেমনি মহৎ শিল্পের লক্ষণই হচ্ছে, অপর যে শিল্পটা তাহার সংস্পর্শে আসে সেটাকে লোপ না করিয়া, পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লয়।

এক প্রকারের রোগ আছে তাহাতে জঠরাগ্নি এত প্রবল হয় যে, যাহা খাও তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায় ও মানুষটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার চাহিতে থাকে। এই অপরি-

মিত আহারের ফলে দাঁড়ায় এই যে, মানুষটাকে চোখে দেখিলে বোধ হয় সে বেশ নধর ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু ভিতরে শোণিতের পরিবর্ত্তে মেদ জমিতে জমিতে একদিন লোকটা বুক নয়তো পেট ফাটিয়া মারা পড়ে। কোন কারণে adapting শক্তিটা হারাইলে শিল্পেরও এই দশা হয়। সে ক্রমাগত আমাদের মত বাহির হইতে র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো ; ব্রাসেল কার্পেট, ফ্রেঞ্চ কেদারা,ইতালীয় ভিলা, পম্পস্থ, জার্ম্মান উল ও প্রিণ্টেড ছিট adopt করিতে থাকে ; সেগুলাকে adapt করিতে অক্ষম হইয়া, আর তারি ফলে নিজের সঞ্চয়গুলার ভারে দম আটকাইয়া মারা পড়িয়া যক্ষের মত আমাদের রুধির শোষক হইয়া বিদ্যমান থাকে। মনুষ্য-শরীরে পরিপাক শক্তির মত যদি আমাদের শিল্পে adapting শক্তি না থাকিত তবে সে পুরাকালে স্বচ্ছন্দ-সুন্দররূপে প্রকাশিত থাকিতে পারিত না ; এবং আজ প্রায় শতাব্দির উপর আমাদের adopt-করা বুট ইত্যাদির নির্ঘাত ভার নির্যাতন সহিয়াও তাহাকে আবার মাথা নাড়া দিতে দেখিতাম না। বৌদ্ধ যুগ হইতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্র ধর্ম্ম, বিচিত্র সভ্যতা, তেমনি নূতন নূতন শিল্প আসিয়া আমাদের শিল্পের সঙ্গে কত যে মিলিয়াছে তাহার অন্ত নাই ; কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া আমাদের শিল্পের চিরপুরাতন ধ্রুবপদের পবিত্র স্বর সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই—

প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ
তথা নান্যেন মার্গেন প্রত্যক্ষেণাপিবা খলু॥

নাভি যেমন শরীরের মধ্য-বিন্দু, তুরস্ক হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট Asiatic শিল্পের মধ্য-বিন্দু তেমনি আমাদের ভারত শিল্প, আর সেই ভারত শিল্পের মূলে হচ্ছে ধ্যান।

জগতে মূর্ত্তি-শিল্পে আমার দেশ একটি মাত্র মূর্ত্তি রাখিয়া গেছে সেটি হচ্ছে বুদ্ধদেবের ধ্যান-মূর্ত্তি,—ইহার তুলনা নাই ইহার জোড়া নাই। যে স্তরে এই বুদ্ধমূর্ত্তির আসন, গ্রীক মূর্ত্তি-শিল্প, তাহার সমস্ত নৈপুণ্য সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া, শিল্পের সেই স্তরে আসিয়া পৌঁছে নাই।

এই বুদ্ধমূর্ত্তির আলোচনা করিবার সময় হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন ;—

"Now Buddha as we know attained to his Buddhahood at the close of a long fast ; and according to the Canons of Europen art he should have been represented in a state of extreme emaciation...but the Indian Sculptors never descended to such vulgarity. With their finer artistic insight they would not take the hidiousness of the starvation as the Symbol of their worship ; they thought not of the

feeble wasted human body but only of the spiritual strength and beauty the Master had gained through his enlightment. They gave him a new spiritualised body,broad shouldered, deep chested, golden coloured, smooth skinned supple and lithe as a young lion.

ভারতশিল্প আমাদের কি দিতে চাহে ও দিতে পারে এক বুদ্ধমূর্ত্তিতে আর শুক্রচার্য্যের কয় ছত্র শ্লোকে তাহা স্পষ্ট বলিয়া গেছে।

ভারতশিল্পের কাছে আমরা যদি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি চাহিতাম তবে সে আমাদের গোলদিঘীর ধারে ইতালীয় শিল্পশাস্ত্রানুসারে গঠিত জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখশ্রী ওই ক্ষীণবল বৃদ্ধমূর্ত্তিটি দিতে চেষ্টা করিত না ; কিন্তু সাগরের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর জ্ঞানজ্যোতিতে সমুজ্জল তাঁহার তেজোময় অমর মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মনে আছেন সেই মানস মূর্ত্তি, দিবার চেষ্টা পাইত।

আমার পিতামহের কোন মূর্ত্তি কি প্রতিকৃতি আজ প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া পিতামহের মূর্ত্তি না থাকার অভাবটা বড় বোধ করিতে পারি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও বৃদ্ধদের মুখে গল্প ও বর্ণনা শুনিয়া পিতামহের একটা কমনীয় হাস্যময় প্রফুল্ল মূর্ত্তি আমার মনে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ একদিন বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে পিতামহের এক তৈলচিত্র পাওয়া গেল। অবশ্য এই আবিষ্কারে আনন্দলাভ করিলাম ; কিন্তু দাদামহাশয়ের চেহারা দেখিয়া নিরাশও যে হই নাই তাহা বলিতে পারি না। ইনিতো আমার সে দাদামহাশয় নন ;—সে নধর শরীর, পুষ্ট হাস্যময় মুখশ্রী, ধূতি চাদরে আলু আলু বেশ কিছুই নাই ! ছবিটা যে তাঁহারই Portrait তাহার লিখিত পড়িত অব্যর্থ প্রমাণ সত্বেও পরিবারের অনেক বৃদ্ধারা অস্বীকার করিয়া বসিলেন ; আমিও তাঁহাদের মতে মত দিয়া ছবিটা Family Portrait galleryতে রাখিলাম বটে, কিন্তু মনে আমার সেই দাদামহাশয়ের মানসমূর্ত্তি, তাঁহার নির্ভুল পার্থিব প্রতিমূর্ত্তির চেয়ে, জীবন্ত সত্যরূপে জাগাইয়া রাখিলাম ; এবং দাদামহাশয়ের অভাব তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ পরিপূরণ হইল। এরূপটা কেন হয় বলিতে পার ? বোধ হয়, চোখে আমরা নিখিল পদার্থের মায়াচ্ছন্ন ছদ্ম মূর্ত্তিটা দেখি আর মনে সত্য মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই বলিয়া। শাস্ত্রেও তো বলে সত্যটা চোখে দেখা যায় না, মনে ধরা দেয়।

আমাদের শিল্প বলে বিদ্যাসাগরের জরাজীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর মাটির দেহের ছাঁচ লইয়া কি লাভ ;—এই লও আমি তোমাকে সেই মুক্ত আত্মার অজর মূর্ত্তি দিতেছি—যে মূর্ত্তিতে তিনি দেবলোকে বাস করিতেছেন এবং যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মানসলোকে বিরাজ করিতে চাহেন।

এইখানেই আমাদের শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের মূলগত প্রভেদ। এই প্রভেদ হ্যাভেল সাহেব অতি সুন্দর করিয়া ব্যাখা করিয়াছেন ;—

Europen art has, as it were, its wings clipped ; it knows only the beauty of earthly things. Indian art soaring into the highest emphyrean, is ever trying to bring down to earth something of the beauty of the things above...Physical beauty was to the Greeks a divine characteristic, the perfect human animal received divine honours from them both before and after death.

The Hindu artist has an entirely different starting point. He believes that the highest type of beauty must be sought after, not in imitation or selection of human or natural forms but in the endavours to suggest something finer and more subtle than ordinary physical beauty.....Indian art is essentially idealistic mystic symbolic and transcendental. The artist is both priest and poet.

Asiatic art আমাদের কি দিয়াছে এবং দিতে পারে দেখিলাম ; এখন যে European artএর দিকে আমরা মৃগতৃষ্ণিকালুব্ধের মত ছুটিতে চলিয়াছি সেইটাইবা আমাদের কি দিয়াছে বা দিতে পারে দেখিব। পূর্ব্ব শিল্পের ইতিহাসটা আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই পাশ্চাত্য-শিল্পরাহুর কবলে কেবল আজ আমরাই যে পড়িয়াছি এমন নয় ; পুরাকালে এই জম্বুদ্বীপের একটি নাতিবৃহৎ অংশের অত্যধিক উদারচেতা রাজা ও প্রজা-মণ্ডলী, গান্ধার প্রদেশের, art school নয়, art পাঠশালা গুলায় অত্যধিক পরিমাণে গ্রেকো-রোম্যান শিল্প ও শিল্প-শিক্ষকের আমদানি করিয়া আমাদের কলালক্ষ্মীর গালে চিরদিনের জন্য গোরা-কলঙ্ক লেপন করিয়া গিয়াছেন। যে শিল্পীর কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য বোধ আছে, হ্যাভেল সাহেবের সহিত একমত হইয়া সেই বলিবে—"The Buddhas and Budhi Sattavas of this period are soulless puppets, debased types of the Greek and Roman pantheon posing uncomfortably in the attitudes of Indian asceticism. Not even in the best types of Gandhara do we find the sparitulity the worshipfulness of the true Indian ideal.

কথায় বলে History repeats itself. কি আশ্চর্য্য

যখনই আমরা পাশ্চাত্য শিল্পের পিছনে ছুটিয়াছি তখনই এইরূপ কুকাণ্ড করিয়া বসিয়াছি !

গোরাশিল্প আমাদের কি দিয়াছে দেখিলাম। কি দিতে পারে অর্থাৎ সে শিল্পদেবতাটি কত ক্ষমতাবান তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Nordau'এর মুখ হইতে শুনিয়া লই। পণ্ডিত তাঁহার নিজের দেশের শিল্প সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিতেছেন—The art of future will be no *little chapel* but a mighty cathedral *wide enough* to admit the whole mankind and that will be exactly *its vocation : to be hallowed place* wherein mankind will rise again to the *childship of God* for which religion has educated them in past stages of evolution.

কয়ছত্র হঠাৎ পড়িলে ইউরোপীয় শিল্পের বিরাট ভবিষ্যৎ আশায় মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু কথটা তলাইয়া বুঝিলে দেখি,—কাহার কাছে পণ্ডিত জগজ্জয়ের আশা করিতেছেন, এবং সে ভিত্তিটাই বা কিরূপ যাহার উপরে তিনি তাঁহার গগনস্পর্শী শিল্পগির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে চাহেন ;—little chapel, wide enough নয় ; এমন art যাহার vocationটা exactly এখনও ঠিক হয় নাই ; little chapel যাহা cathedral হইলে তবে hallowed হইবে এবং সেটা হইলে যেখানে আমরা

childship of God পাইয়া অমর হইব! ভ্রূণ নিরাপদে গর্ভাবস্থা কাটাইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে; ভূমিষ্ঠ হইয়া প্লেগ, বসন্ত, অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু কাটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ হইয়া দিগ্বিজয় করিবে!—এতদিন আমাদের ধৈর্য্য ধরিতে হইবে, আশা প্রতীক্ষা করিতে হইবে! এটা যে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত শুনাইতেছে; কিন্তু উপন্যাসের কাচের বাসনের মত এ স্বপ্নটাও যে হঠাৎ পদাঘাতে চূর্ণ হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে! আমাদের ধৈর্য্য সহজে নষ্ট হয় না কিন্তু তাহারও তো একটা সীমা থাকা চাই। Childship of God আমরাও পাইতে চাহি। "দেবাণাং প্রতিবিম্বানি কুর্য্যাচ্ছ্রেয়স্করাণি চ স্বর্গ্যানি" ইত্যাদি ভারত-শিল্পের মূলমন্ত্র কি আমাদের সেই পথই নির্দ্দেশ করিতেছে না? ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল কঠোর সাধনার ফলে এই European দেবতাটি আমাদের দিয়াছেন কি? দুঃখ দিয়াছেন, দৈন্য দিয়াছেন,আর দিয়াছেন তাঁহারই সন্তানগণের মুখের বাক্যবাণ! ইনি আমাদের আপনার বলিবার কিছু রাখেন নাই;—যদিও আমরা নিতান্ত আপনার লোকের মত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার দেশের Furniture, Oilpainting কেদারা চৌকি দিয়া সাহেবী পছন্দমত ঘরখানি সাজাইয়াছি।

শাস্ত্রে আছে দেবতা সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে আসিয়া আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যান। সকলের সে সৌভাগ্য

ঘটে না, সেই জন্য সহজে বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু আমি সেটা অবিশ্বাস করিতে পারি না। এইরূপ, ইউরোপ হইতে সেখানকার শিল্পদেবতাই হউক, বা কোন দেবদূতই হউক, অল্পদিন হইল, কেহ একজন—এক ফরাসী কুমারী artist বেশে আমাদের বাড়িতে দেখা দিয়া আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গেছেন তাহা বলিতে আনন্দও হয় আবার চক্ষু ফাটিয়া জলও আসে। কন্যা পৃথিবী ঘুরিয়া আমাদের দেশের রাজারাজড়ার ঘর বাড়ি আসবাবপত্র তন্ন তন্ন পরখ করিয়া যখন আমায় আসিয়া বলিলেন—সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া এই আমি এক-মাত্র তোমাদের ঘরে স্বজাতীয় শিল্পের আদর ও চর্চ্চা দেখিতেছি—তখন মহিলাটির কথায় প্রথমটা আমার একটু আনন্দ ও গর্ব্ব হইল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতিত দেশের শিল্পকলার দুর্গতির একটা জীবন্ত ছবি হৃদয়ে বিঁধিয়া রহিল। আমার সেইদিন হইতে কেবলি মনে হইতেছে—হায়রে, যার জন্যে চুরি করিলাম সেই বলিয়া গেল চোর !!

মানসচর্চ্চা

শিল্পজগতে প্রথম পদার্পণ করিতেই গুরুর আদেশ হইল —Study nature ; এবং সাধ্যমত গুরু-উপদেশ অবহেলা না করিয়া গাছপালা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, স্থাবর-অস্থাবর, যা-কিছু দেখিলাম ও হাতের কাছে পাইলাম, তাহারই নকল লইতে লাগিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, গাছটা, মানুষটা, গরুটা রং দিয়া, পেন্সিল দিয়া শাদা কাগজে ঠিক নকল করিতে পারিলেই এবং মানুষটা মানুষ দেখিয়া, গাছটা গাছ দেখিয়া নকল করিলেই Nature Study করিলাম ও artistনামের যোগ্য হইলাম। তখন মনে হইত, Natural objectsএর imitation অর্থাৎ কোন-একটা জিনিষের অনুকরণটাই বুঝি artএর চরম! কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে, ঠিক সেরূপটা করিলে অর্থাৎ নকল করিয়া চলিলে art হয় না। Natureএর interpretation—ব্যাখ্যা দেওয়ারই নাম art অর্থাৎ Natureটা Study করিয়া সেটাকে আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, আমার মন Natureটাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহারই একটা সরল সুন্দর ছাব প্রকাশ করাই artistএর উদ্দেশ্য। বুঝিতেছি, মনের কথাটা পরিষ্কার করিয়া, সুন্দর করিয়া খুলিয়া দেখানোর নামart। মানুষটার মনুষ্যত্ব, গরুটার গোভাব, পুষ্পের

ভিতরকার কথাটুকু লইয়াই artistএর কারবার। এবং সে-ই যথার্থ artist, যে চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায় ও না যায়, মনশ্চক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া নিপুণহস্তে কাগজে-কলমে-তুলিতে কিংবা পেন্সিলে কণ্ঠস্বরে অথবা অঙ্গভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করে।

Imitation যদি artএর চরম হইত, তবে পৃথিবীতে কবিগণের স্থান হরবোলায় অধিকার করিত,—সঙ্গীতাচার্য্যের স্থান Gramophone ও নর্ত্তকীগণের আসর কলের পুত্তলিকায় অধিকার করিত। কোকিলের কুহুস্বরটা কবিগণ অপেক্ষা হরবোলা তো আমাদের জলজীয়ন্তভাবে শুনাইয়া দেয়!—যে বসন্তের ভাব আমাদের মনে আনিয়া দিতে কবিগণ ছন্দের পর ছন্দ, কথার পর কথা গাঁথিয়া চলেন, হরবোলা তো গলার জোরে সেটা সারিয়া লয়, তবে কেন না হরবোলাকে কবির আসন দিই, কেন না তাহাকে True poet বলিয়া ভক্তি করি?

টিয়াপাখীর স্বভাব নয় মানুষের স্বরে কথা কওয়া; হরবোলার স্বভাব নয় পাখীর সুরে গান গাওয়া। দুই জায়গাতেই স্বভাবের অভাব, দুইটাই অনুকরণ এবং অনুকরণ বলিয়াই artহিসাবে নগণ্য। স্বভাবের অভাব যেখানে, artএরও অভাব সেখানে।

লোক ঠিক পাখীর ডাক ডাকিতেছে, পাখীটা ঠিক মানুষের বুলি বলিতেছে, ইহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন

করিতে পারে মাত্র, প্রাণ স্পর্শ করে না, মনের দ্বার খুলিয়া দেয় না। এই মনের দ্বার খুলিতে মনই একমাত্র চাবি। মন দিয়া তবে মন পাইতে হয়। সকল শিল্পেরই এই সার্থকতা —মন পাওয়া ;—দর্শকের মন, শ্রোতার মন, পাঠকের মন আকর্ষণ করা। পৃথিবীতে ভাট অনেক আছে, কিন্তু এমন ভাট কয়জন, যার রূপবর্ণনা শুনিয়া বলা চলে— 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট'। পৃথিবীতে কতকাল ধরিয়া কত না শিল্পী ছবি আঁকিয়া আসিতেছে, মূর্ত্তি গড়িয়া চলিয়াছে, জগতের সকল শিল্পী যদি একত্র হয়, তবে কলিকাতাসহরে স্থানসঙ্কুলান হয় কি না সন্দেহ। যদি, যত কেম্বিস্, কাগজ, পেন্সিল, রং তুলি, পাথর ইত্যাদি যাহা শিল্পীগণ এ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে, একটা স্তূপ করিয়া রাখা হয়, তবে হিমালয় না হোক, ছোটখাট একটা পাহাড়প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়,—কিন্তু ইহার কয়খানা কেম্বিস্ ছবিনামের যোগ্য হইয়াছে, কয়জন artistএর কাজ আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে ? গণিয়া দেখিলে পঞ্চাশজন হয় কি না সন্দেহ। শিল্পী যদি চিত্রে কিংবা সঙ্গীতে, কাব্যে বা অঙ্গভঙ্গীতে নিজের মন দিতে না পারিল, তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা,—সে কাহারও মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এই মন কেমন করিয়া দেওয়া যায় ? উত্তরে এইটুকু বলা চলে, তোমার মন তুমি যে কেমন করিয়া দিবে,

তাহা আমার শেখান অসম্ভব। কাজেই artজিনিষটার সঙ্গে যখন মনের এত গূঢ় সম্বন্ধ, তখন সেটাও শেখান চলে না। এইটুকু বলা চলে যে, স্বভাবের শরণাপন্ন হও; তুমি শিল্পী যেটা গড়িতে চাও তাহার স্বভাবটুকু বুঝিতে চেষ্টা কর এবং সেটুকু বুঝিয়া নিজের স্বভাব অনুসারে জিনিষটার ব্যাখ্যা দাও।

আমাদের চারিদিকের সহিত নিজের মনটা মিলানোর নামই Nature Study. Nature তোমার নিকটে কখনই ধরা দিবে না,—যদি মনের দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবার সুবিধা না দাও ও তাহার সুরে তোমার সুর মিলাইবার সুবিধা না দাও। এও একপ্রকার যোগবিশেষ, —ইহারও মূলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তের অত্যন্ত প্রশান্তির প্রতিকূল বৃত্তিসকলের নিরোধ করিয়া মন যখন স্থির সরোবরের মত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখনই Natureএর প্রতিবিম্ব আমার মনে আসিয়া পড়ে; অস্থিরচিত্তের, অন্য-মনার তাহা ঘটে না এবং সেইজন্য প্রকৃত Nature-Study তাহার পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Nature Studyর অর্থ স্বভাবের ভাব বোঝা, Copy করিয়া চলা নয়; artএর অর্থ imitation নয়, interpretation. আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না যে, জিনিষটা যেমন দেখিতেছি, তেমন্ করিয়া আঁকিলাম, অথচ আমি artist নয়; আর একজন ঠিক জিনিষটা না আঁকিয়াও artist

বলিয়া চলিয়া যায় কেমন করিয়া! ছাঁচ লওয়ার নাম যদি art হইত, তবে কোন তর্ক ছিল না—কিন্তু art যদি Natureএর interpretation অর্থা ব্যাখ্যা হয়, যদি artএর অর্থ অন্তরের কথা প্রকাশ করা বলিয়া স্থির হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যেটুকু আমরা দেখি, তাহা দেখাই নয়, অন্তরিন্দ্রিয়ই শিল্পীর একমাত্র ভরসা। শিল্পীর স্বভাবই হচ্ছে imaginative, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর অপেক্ষা মনশ্চক্ষে সে স্পষ্টতর দেখিতে পায়, এবং এই মনশ্চক্ষে দেখিয়া যখন সে জিনিষটা গঠন করে, দর্শকের মন আকর্ষণ করা তখন তাহার পক্ষে সহজ হয়। আমরা চারিদিকে যাহা দেখি, এই নিয়ত বিচিত্র জগৎ সংসার, ইহার সহিত আমাদের মনের ও আমাদের মনের সহিত ইহার যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য এবং সেই জন্যই আমরা Nature Studyর অর্থ অন্য বুঝিয়া ভুল করি।

যাহারা Natureকে Study করে অর্থাৎ Natureএর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করে, আর যাহারা Nature Studyর অর্থ Natureকে Copy করিয়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া মনে করিয়া চলে, তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমার শরীরের কোথায় কোন অস্থি আছে, আমার জননীর অপেক্ষা ডাক্তার অধিক জানেন—কিন্তু আমার মনের সন্ধান মা ছাড়া, শরীরটা শতখণ্ড করিলেও,

ডাক্তারের পাইবার উপায় নাই। ডাক্তার চর্ম্মচক্ষে দেখেন, আর মাতা দেখেন মনশ্চক্ষে। Natureএর সহিত এই প্রিয়তর, নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপনই Nature Studyর সার্থকতা,—ডাক্তারের মত শবচ্ছেদব্যাপার নয়। যাহার মনশ্চক্ষু খুলিয়া গেছে, স্বভাবের স্বভাব তাহার কাছে প্রিয়জনের কাছে প্রিয়ের স্বভাবের মত সহজে বোধগম্য। এই মনের বিকাশই শিল্পের বিকাশ। জগতের যা-কিছু সু-কু সুন্দর-অসুন্দর পঞ্চ ইন্দ্রিয়পথে আমাদের মনের উপরে নিয়ত বর্ষিত হইতেছে, তাহা সেখানে সঞ্চিত হইতেছে; এই সঞ্চয় মধুর আকারে মধুচক্র হইতে মধুবিন্দুর মত বিতরণ করাই শিল্পীর ধর্ম্ম এবং সেই ক্ষমতালাভের চেষ্টাই শিল্পীর সাধনা। এই সাধনার পথে অগ্রসর করিবার জন্য আমাদের শিল্পাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু॥"

সেইজন্য জাপানশিল্পসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় Parcival Lowell তাঁহার Soul of the East নামক পুস্তকে প্রাচ্যশিল্পকে মানসপ্রতিমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—It portays an emotion called up by a scene and not the scene itself in all its elaborate complexity. "প্রাকৃতিক কোন-একটা দৃশ্য দেখিয়া মনে যে ভাবতরঙ্গ ওঠে, ইহা তাহারই প্রতিরূপ,

নিখুঁত দৃশ্যটা নয়।" 'It is the expression caught from a glimpse of the soul of nature by the soul of man.'—মানুষের মন প্রকৃতির মনের যেটুকু ধরিয়াছে, এটা তাহারই যেন প্রকাশমাত্র।

শিল্পীর মন শিল্পে পাই বলিয়া শিল্পের আদর করি, নচেৎ হিমালয়পর্ব্বতটা চতুষ্কোণ কয়েক ইঞ্চি-পরিমিত ফ্রেমে বাঁধাইয়া এবং সেটাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া আমার কি লাভ!—হিমালয় দেখিতে যাওয়া এত কি কঠিন ব্যাপার? হিমালয়ের মনের কথাটিরই দরকার। শিল্পীর সেই কাজ, সে মন দিয়া মনের কথাটি ধরিবে এবং সেই কথাটি আমার মনে গাঁথিয়া দিবে।

আমাদের চারিদিকে প্রকৃতি কত গন্ধ, কত বর্ণ, কত আনন্দ, কত ঝড় বাতাস, শোক দুঃখ লইয়া উদ্দাম বিচিত্র অস্থির গতিতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে? আমরা কেহ টাকার থলি লইয়া ব্যস্ত, কেহ অন্নের চিন্তায় হাহা করিয়া বেড়াইতেছি, কেহ লালসায় মত্ত, কেহ স্বার্থ লইয়া ফিরিতেছি। এই যে গ্রীষ্মবর্ষা দুইটা শ্রেষ্ঠ ঋতুর সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সুখদুঃখের পরিপূর্ণতা লইয়া কয়টি মাস আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া হাসিয়া-খেলিয়া-কাঁদিয়া গেল, আমরা তাহাদের দিকে কি ফিরিয়া দেখিয়াছি, না তাহাদের কথায় মনোযোগ দিয়াছি? অথচ আমরা art schoolএ আসিতেছি, artist হইতে চাহিতেছি।

একটা গাছ, গোটাকতক মানুষ, গরু, ঘটিবাটি আঁকিয়া মনে করিতেছি, nature study করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক করিতেছি কি? আপনাকে বঞ্চনা করিতেছি, অমূল্য জীবনের দিনরাত্রিগুলা বৃথায় যাইতে দিতেছি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরূপ, আত্মার বিকাশরূপ অমূল্যধন হেলায় হারাইতেছি! আমি এরূপ বলিতেছি না যে, শিল্পী কাজকর্ম্ম, খাওয়াদাওয়া, স্ত্রীপুত্র, সংসারচিন্তা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ফুলের মধু, দক্ষিণের বাতাস, মেঘের খেলা লইয়া জীবন কাটাইবে! তাহাকে কাজও করিতে হইবে, অন্নচিন্তাও করিতে হইবে, সংসারের ভাবনাও ভাবিতে হইবে, অর্থও রোজগার করিতে হইবে, কিন্তু সেগুলাকে পাথরের মত মনের দ্বার চাপিয়া বসিতে দিলে চলিবে না, মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা চাই—'বন্ধু কখন্ কোন বেশে আসেন ঠিক নাই, তিনি যেন দ্বার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া না যান।'

দুটি বন্ধুকে নির্দ্দেশ করিয়া আমরা অনেকসময় চলিত-ভাষায় বলিয়া থাকি 'দুইজনে খুব ভাব' অর্থাৎ এ উহার এবং ও ইহার ভাব বেশ বুঝিয়াছে, দুইজনের স্বভাব দুজনে বেশ চিনিয়াছে এবং সেইজন্যই উভয়ের মন উভয়ের দিকে টানিতেছে। প্রকৃতির সহিত এই মনের পরিণয় শিল্প-সাধনার চরম। প্রকৃতির সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিতে পারিলে দেখিবে, তুমি অন্যমনা থাকিলেও ঠিক সময়ে

প্রকৃতি আসিয়া অযাচিতভাবে তোমাকে জাগাইয়া দিয়া যাইবে। তখন আর ভাববিহঙ্গ ধরিবার জন্য তোমায় ব্যাধের মত জাল পাতিয়া আসার আশায় রহিতে হইবে না, পাখী আসিয়া আপনিই ধরা দিতে থাকিবে।

গ্রীকৃশিল্পীগণের গঠিত যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আজকার দিনে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি, সেইগুলি এই প্রকৃতির সহিত মানবমনের বন্ধুতার ফল। গ্রীকৃশিল্পী যাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিসকল গড়িয়াছিল, তাহারা বাতাস খাইয়া, ফুলের মধু চাখিয়া জীবনধারণ করিত না—স্ত্রীপুত্রের ভাবনা তাহারাও করিত, তাহা সত্ত্বেও তাহারা এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিসকল কোথা হইতে পাইল! সেকালের মানুষ কি এমনি সুন্দর ছিল, না এগুলা তাহাদের মনগড়া মূর্ত্তি! গ্রীকৃমূর্ত্তিগুলা যে মানুষের নকল নয়, সেটা স্থিরনিশ্চয়; সেগুলা যে কোন প্রাচীন মূর্ত্তিসকলের অনুকরণে গঠিত হয় নাই, তাহাও স্থির; তবে সেগুলার সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল? গ্রীকৃশিল্পী নিশ্চয়ই স্বভাবের সহিত ভাব করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহারই ফলে দুর্লভ রত্নের অধিকারী হইয়াছিল—যে স্পর্শমণির সন্ধানে আমরা চলিয়াছি।

গ্রীকৃজাতি 'আয়োলিয়ান্ হার্প' (বায়ব্যবীণা) নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল; সেটা তাহারা গৃহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিত। সে বীণা এমনি বিচিত্র যে, সামান্য বায়ুর তরঙ্গ তাহাতে আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে

"They aim not at a literal transcription of nature but at an expression of its inner significance...Directness, reticence and restraint are its main characteristics. To present the essential quality of a scene, not its mere outward appearance and that with best possible obtrusion of the material was its object."

জাপানীশিল্পের ইহাই লক্ষ্য।

এখন মোট কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—

আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পীর কর্ত্তব্য—চাক্ষুষ সমস্ত পদার্থ এবং বাস্তবজগৎ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কেবল ধ্যানের দ্বারা হৃদয়পটে যে মূর্ত্তির উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ করিতে যত্ন করা।

গ্রীকৃশিল্পীর মতে—বাস্তবজগতের ও চাক্ষুষ পদার্থ-সকলের সুন্দর অংশ একত্র করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একটা-একটা প্রতিমা খাড়া করাই শিল্পের চরম উৎকর্ষ।

জাপানী শিল্পীর কাছে—সুন্দর-অসুন্দর, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, সকলি সমান। গোচর-অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম্মগ্রহণ কর এবং সেই মর্ম্মকথা সহজে সুসংযতভাবে, পরিষ্কাররূপে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর তিনটা মহাদেশে তিন বিভিন্ন জাতির মধ্যে

শিল্পের এই তিন আদর্শ তিনটি বিজয়স্তম্ভের মত আজিও বিদ্যমান। হঠাৎ দেখিলে তিনটা শিল্পই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বোধ হয়, কিন্তু গোড়ার কথা তিনেই এক। সেই মানস-প্রতিমা ও ধ্যানের প্রভাব তিনের ভিতরেই ফল্গুনদীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে।

গ্রীক্‌শিল্পী যখন কোন নারীপ্রতিমা কিংবা কোন বীরমূর্ত্তি গড়িয়াছে, তখন সে কোন মডেলের অপেক্ষা রাখে নাই; সে তাহার মানসপটে দৃঢ়তার যে আদর্শ কিংবা সৌন্দর্য্যের যে সুকুমার ভাবটি বহু সাধনায় পরিস্ফুট করিয়াছিল, সেইটাই জড় প্রস্তরে যথাসাধ্য আরোপ করিয়াছিল। যদি তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ দেখিয়া তবে গড়িতে হইত, তাহা হইলে জগতে গ্রীক্‌শিল্পের সৃষ্টিই হইত না।

জাপানীশিল্পীও তূলির দুই টানে মুহূর্ত্তমধ্যে যখন অনন্ত আকাশে উড্ডীন মরালশ্রেণী আঁকিয়া ফেলিল, তখন মেঘালোকে রাজহংসগণের আনন্দকাকলি ও অপ্রতিহত গতিবেগের একটা যে ধারণা তাহার মনে ছিল সেইটুকু প্রকাশ করিয়াই সে ক্ষান্ত রহিল। হাঁসটা ঠিক ডাক্তারিমতে anatomical হাঁস হইল কি না, দেখিবার ইচ্ছাও রাখিল না।

তেম্‌নি ভারতবর্ষের শিল্পীও যখন যেটি গড়িল, যথাশাস্ত্র ধ্যান ধরিয়া নিজের মানসপ্রতিমারূপেই গড়িল। ব্রহ্মার চার মুখ, বিষ্ণুর চার হস্ত দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিল না; শাস্ত্রোক্ত ধ্যানটুকু ধরিয়া সে যথাসাধ্য ব্রহ্ম-জ্যোতি

কিংবা বিষ্ণুতেজের একটা একটা অপার্থিব প্রতিমা খাড়া করিয়া তুলিল। মানুষ-মডেলের অপেক্ষাই রাখিল না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একই মানসপ্রতিমা তিন শিল্পেরই লক্ষ্য, সেই একই মানসদেবতা তিনেতেই বিদ্য-মান। ত্রিমূর্ত্তি যেমন তিনই এক, একই তিন, ইনিও তাই। আমাদের দেশে ইনি ভোলানাথমূর্ত্তিতে বিরাজমান, এককালে সংসারত্যাগী, কেমন যেন পাগলাটে। গ্রীসে ইনি পুরুষোত্তম, শ্রীসৌন্দর্য্যসেবিত; আর জাপানে ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা, যা মনে করেন, তাই হয়।

এ ছাড়া, এই কলিকালে আর এক—শিল্পদেবতা বলা চলে না—উপদেবতা আমাদের মধ্যে আপনার প্রভাব বেশ বিস্তার করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে ইনি সম্পূর্ণ তফাৎ। লক্ষ্মীঠাকুরাণী যেমন কাহারও কাহারও ঘরে টাকার থলিরূপে পূজিতা, এই শিল্প-উপদেবতাটিও তেম্‌নি ধনদরূপে ইউরোপের ঘরে ঘরে উপাসিত এবং নবশিক্ষিত আমাদের মধ্যেও বেশ আদরে-যত্নে পূজা পাইতেছেন। এই আজকালকার ইউরোপীয় কলাবিদ্যা পণ্যশালার বেশ-ভূষার চাক্‌চিক্যে সাজিয়া-গুজিয়া বাঁধাদরে এবং লোক-বিশেষে চড়া দরেও আপনাকে বিক্রয় করেন। ইনিও বলেন, স্বর্গকামনাই ইঁহার চরম লক্ষ্য, কিন্তু টাকার থলি টেঁকে লইয়া; কাজেই যাহারা টাকা দিবে, তাহাদের আগে সন্তুষ্ট কর এবং পার তো সময়মত হরিনামটা করিয়া লইও।

ইঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে, গড়ের মাঠে ইনি খাস বিলাতি-আমদানি ডফ্‌রীনমূর্ত্তিতে বিদ্যমান এবং আমাদের ঠাকুরঘরেও কার্ত্তিকটি সাজিয়া ইনিই বসিয়া আছেন। জাপানে ইনি এখনও বড় দেখা দেন নাই, কিন্তু জাপান আর কিছু-দিন সাহেবীদলে মিশিলে কি হইত বলা যায় না। পুণ্যশেষে পুণ্যবান্ যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হন, তেম্‌নি সেই প্রাচীন গ্রীকশিল্প লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই শিল্পে দাঁড়াইয়াছে, অতএব আমরা ইহাকে ভ্রষ্টশিল্প বলিতে পারি। গ্রীক্‌শিল্প আর্য্যশিল্পের মত মর্ত্ত্যলোক হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখে নাই ;—সে নরদেবের উপাসনা শিখিয়াছিল, দেবতাকে দেখিতে চায় নাই, তাই তার দুর্দ্দশা !

ঘরের দেওয়ালে চিত্র করিবার সময় শিল্পীকে যেমন একমাত্রা চড়াইয়া রং লাগাইতে হয়—কালে সেটুকু মরিয়া ঠিক দাঁড়াইবে—সেইরূপ শিল্পের লক্ষ্য পার্থিব হইতে একধাপ উচ্চে না রাখিলে চলে না ; এটুকু আমাদের শিল্পাচার্য্যেরা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, নরদেব হইতে নরে নামিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পতন পাপ প্রবল না হইলে শীঘ্র ঘটে না। মানবশিল্পে মানুষ-ভাব থাকিবেই, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মানুষভাবকে প্রশ্রয় দিলে একদিন দেবসেনাপতি যে কাপ্তেন্‌বাবুতে নামিবেন, এ সত্যটা শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পাচার্য্যেরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিল্পীর আদর্শ যতটা পারেন উচ্চে তুলিয়া

দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই দেবতার দিকে অতটা ঝোঁক দিয়াছিলেন। ঋষিবাক্যের সত্যতা, গ্রীক্ এবং আর্য্য শিল্পের মধ্যে কোন্‌টার কিরূপ পতন হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলেই, বেশ উপলব্ধি হইবে। জাপানের শিল্পকে আমরা ইহার ভিতর আনিতে পারি না, কারণ এখনও তাহার উঠিবার মুখ।

ভারতবর্ষে আর্য্যশিল্পের আদর্শগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাতে পর-পর প্রধানত তিনটা স্তর দেখা যায়। একটা খাঁটি ব্রাহ্মণ্যশিল্প, দ্বিতীয়টা বৌদ্ধশিল্প, আর তৃতীয়টা মোগলশিল্প।

ব্রাহ্মণ্যশিল্পে অপ্রাকৃতের চূড়ান্ত প্রভাব দৃষ্ট হয়, সে সকল গঠন পার্থিব হইতে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন। নরসিংহ, দশগ্রীব, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, এমন কি শ্রীরামে নবদূর্ব্বাদল ও শ্রীকৃষ্ণে নবীননীরদকান্তির মধ্যেও অপ্রাকৃতের প্রভাব। যেন একটা সৃষ্টিছাড়া খাম্‌খেয়ালি-গোছের, আলুথালু ভোলানাথমূর্ত্তি। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ছেলেখেলা, কিন্তু তাহারও ভিতরে মহামুক্তির যে উৎকট আনন্দ-উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান, সেটি জগতের কোন শিল্পে কোনকালে পাওয়া যায় না। একালের একএকটা মূর্ত্তি দৈবতেজে মানুষ হইতে যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া বসিয়া আছে; অতি অভাবনীয়! স্পর্শ করিতে ভয় হয়, পৃথিবীর দিকে দৃক্‌পাত নাই।

বৌদ্ধযুগে শিল্পদেবতা মানুষের আর একটু কাছে আসিলেন, তাহাতে শিল্পে সম্পূর্ণ মুক্তির উদ্দাম বেগ সংযত-ভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু সে মানুষের বশ্যতা তখনও স্বীকার করিল না। শিল্প বুদ্ধদেবের শরণ লইল, অশোক যে অত বড় সম্রাট্, তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না—কেবল একমনে নির্ব্বিকার বুদ্ধের প্রশান্তমূর্ত্তির ধ্যান ধরিয়া থাকিল। শিল্প যদি সে সময় ধর্ম্মাশোকের পূজা করিত, তবে প্রত্যেক অশোকস্তম্ভের শিখরদেশে অনুশাসনের পরিবর্ত্তে অশোকের নিজমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে দেখিতাম। অতএব বৌদ্ধযুগে আর্যশিল্প যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলা চলে না; ব্রাহ্মণ্যযুগে সে মেঘরাজ্যে বসিয়াছিল, এখন ধরাতলে, কিন্তু দৃষ্টি সেই ঊর্দ্ধমুখেই আছে।

তার পর মোগল-আমল। সে সময় আর্য্যশিল্প স্বাধীনতা হারাইয়া বাদশাহের পদানত হইয়াছে বটে, কিন্তু দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই। বাদশাহ-বেগমের মূর্ত্তি লিখিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিক মানুষটি করিয়া লিখিতে পারে নাই, তাহাতেও অপ্রাকৃতের সম্পূর্ণ প্রভাব; স্বর্ণে, বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে তখনকার একএকটা মূর্ত্তি ঠিক বাদশাবেগমটি না হইয়া রাজশ্রীর যেন একএকটা ধ্যানমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং শাজাহানবাদশার আমলে যেম্‌নি একটু ছাড়া পাইয়াছে, অম্‌নি সে স্বর্গের মুখে ছুটিয়াছে এবং সেখান হইতে বিশুদ্ধ মর্ম্মরে মৃত্যুর এক মহাস্বপ্ন আনিয়া আগ্রায় যমুনাতীরে

বসাইয়া দিয়াছে। দেবতা ছাড়া আর্য্যশিল্প আর কাহাকেও বলে নাই—

'ত্বমসি মম শরণং ত্বমসি মম জীবনম্।'

এখন দেখা যাক্, গ্রীক্‌শিল্পে কতদূর কি হইল—

গ্রীক্‌সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজত্ব মাথা তুলিল এবং রোমরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সীজার্‌গণও মাথা তুলিলেন; সে যে-সে মাথাতোলা নয়, সারা পৃথিবীর একচ্ছত্রসম্রাট্‌রূপে। রোমক কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যেন একটা দর্প আর ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। রোমের সম্রাট্ ক্রমে নরদেব বলিয়া গণ্য হইলেন এবং দেশের সমস্ত শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, কলা এই সকল নরদেবতা ও তাঁহাদের অনুচরগণের সেবায় নিযুক্ত হইল। জুপিটার্ হইতে গ্রীক্‌শিল্প সীজারে নামিল। রোমান্‌দিগের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস যে খুব উচ্চদরের ছিল, তা নয়; সৌন্দর্য্যের উচ্চতর ধারণা গ্রীক্ অপেক্ষা যে তাহাদের অধিক ছিল না, সে কথাও ঠিক; কাজেই শিল্পের আদর্শ এবং সেই সঙ্গে চরম লক্ষ্যটাও খাটো হইয়া আসিল। সৌন্দর্য্যের জ্যোতি গিয়া তাহাতে ক্রমে পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের চাকচিক্যটাই অধিক ফুটিতে লাগিল। ক্রিশ্চিয়ান্‌ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে শিল্প আর একবার মাথা নাড়া দিয়াছিল বটে,—তার প্রমাণ র‍্যাফেলের নিরুপম যিশু ও মাতৃমূর্ত্তিসকলে বিদ্যমান; সে সময়ে শিল্পকলা আর একবার ধর্ম্মবিশ্বাসে নবজীবন লাভ

করিয়া স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত হইয়া ধ্যানের প্রভাব, ধর্ম্মের প্রভাব ঘোষণা করিল, কিন্তু এই দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী, যেমন নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা। যিশুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজতন্ত্রের পতন এবং সেই সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল,—সে যেন আর একটা নূতন রোমরাজত্ব! যিশুর দীনতা, সাম্যভাব এবং শান্তমূর্ত্তি ইহার ছিল না; সীজার্ যেমন, পোপ্‌ও তেম্‌নি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে নরদেবরূপে রোমসিংহাসনে দেখা দিলেন। শিল্পকলা যিশুর উপাসনা ছাড়িয়া পোপ্‌-দিগের পদানত হইল এবং পোপের Vaticanনামক রাজপ্রাসাদে পারিষদগিরি করিতে থাকিল। এখানে কথা উঠিতে পারে যে, র‍্যাফেল্ এবং তাঁহার শিল্প তো পোপদিগের আশ্রয়েই প্রতিপালিত; কিন্তু এ কথা যেন মনে থাকে যে, র‍্যাফেল্‌শিল্প পোপাশ্রিত, কিন্তু পোপায়িত নয়। যে রসে র‍্যাফেল্‌শিল্প রসায়িত, সে রস পোপ্ হইতে আসে নাই, আসিতে পারেও না; সে রস স্বর্গের সুধা, ধর্ম্মবিশ্বাসের পুরস্কার। আমরা গ্রীক্‌শিল্পকলাকে পোপের পারিষদগিরিতে বসাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য 'নলিনীদলগতজলবৎ'—আজ আছে কাল নাই; —পোপ্‌দিগের ক্ষমতা বেলান্ত সূর্য্যের ন্যায় ধীরে ধীরে অস্ত গেল এবং সেই সঙ্গে নানা রাজতন্ত্র ছোট-বড় ছত্রাকের মত ইউরোপের দেশে দেশে গজাইয়া উঠিল। গ্রীক্

শিল্পবেচারা এতদিন যা-হোক-একটা-মহৎ-আশ্রয়ে থাকিয়া কতকটা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াছিল, এবার তাহাকে পাকা-রকমে তোষামোদ আরম্ভ করিতে হইল ; সে রাজা ও রাজ-প্রণয়িনীদিগের উপবনসজ্জার ভার পাইল এবং তাহার সমস্ত স্বাধীনতা ও যা-কিছু উচ্চতর লক্ষ্য ছিল তাহা বিসর্জ্জন দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিতের কাছে নকল দেখাইয়া এবং উহাদের মধ্যে লোকবিশেষের কাছে নকীবি করিয়া দিনে দিনে অধঃ-পাতে গেল। যোগভ্রষ্টের কাছে তপঃসিদ্ধি, আর এই ভ্রষ্টশিল্পের চর্চ্চায় ফললাভের আশা, একইরূপ। কথাটা একটু শক্ত-রকমের হইল ;—আধুনিক ইউরোপীয় কলাবিদ্যা হইতে কিছুই শিখিবার নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ? কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে, এ শিল্পচর্চ্চায় যতটুকু সুফল, কুফল-উৎপত্তির ভয় তার শতগুণ। প্রমাণ খুঁজিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না, আমরাই তার প্রমাণ। এই নবশিক্ষার গুণে আমরা কি ফললাভ করিয়াছি, তাহা দেখিলেই যথেষ্ট। আমরা দেশীয়শিল্পকে উন্নত করিতে পারি নাই, কিন্তু ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি এবং সাধারণের মনে সেই ঘৃণার ভাব যতদূর সম্ভব আমরাই জাগাইয়া তুলিয়াছি। আমরা জনসাধারণকে দোষ দিই যে, তাহারা দেশীয়শিল্পের আদর করে না ; ইহা পাকা শিল্পীর মত কথা নয়। যে সত্য ভাবুক, সে জনসাধারণের অপেক্ষা রাখে না ; যে আসল ধর্ম্মাত্মা, সে যেমন রাজসিংহাসন

তুচ্ছ গণে, সংসারের মান-অপমান, বিচার-অবিচার তাহার কাছে যেমন, খাঁটি শিল্পীরও আসন তেম্‌নি অটল। যে শিল্পকে জনসাধারণ গড়িয়া তোলে, সে শিল্প ক্ষণভঙ্গুর—কিন্তু যে শিল্প জনসাধারণকে গড়িয়া তোলে, সেই শিল্পই শিল্প এবং সেইখানেই শিল্পীর মহত্ত্ব। আমরাই এই বহুবর্ষ ধরিয়া জনসাধারণের মন ইউরোপের ভ্রষ্টশিল্পের দিকে লইয়া গিয়াছি এবং আমরাই ইচ্ছা করিলে সেই মন ফিরাইতে পারি। ইউরোপীয় শিল্পের সুফলটুকু সাপের মাথার মণি ;—আমাদের চিরাগত ভাবের তাগা বাঁধিয়া তবে তাহার দিকে হাত বাড়াইও, নচেৎ মরিতে হইবে।

ইউরোপে শিল্পের কি অধঃপাত হইয়াছে, যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাও, তবে একটা গ্রীক্‌মূর্ত্তি, আর একটা আধুনিক মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখিয়া দেখ, দেখিবে দুটার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ। আধুনিকটা হুবহু মানুষ, নাক-চোখ-চুল-দাড়ি নিখুঁত ; আর গ্রীক্‌মূর্ত্তি মানুষের মত হইয়াও ঠিক মানুষের সঙ্গে কতটাই না তফাৎ। একটা যেন শিল্পদেবতা, পুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান, তিলে তিলে উত্তম, আর আধুনিকটা সত্যপীরের মত মর্ম্মান্তিকরূপে সত্য হইয়া 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'—অতিশয় ভাল নয়—বাক্যকে সার্থক করিতেছে! আবার এই গ্রীক্‌মূর্ত্তির সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু অথবা কোন একটি ধ্যানমূর্ত্তি জুড়িয়া দাও এবং পার তো জাপানের নারামন্দির হইতে এক

বোধিসত্ত্ব আনিয়া বসাও, দেখিবে তিনেতেই এক ধ্যানের প্রভাব বর্ত্তমান। তিনেরই গঠনপারিপাট্য এতই সমান যে, সহসা দেখিলে মনে হইবে, একটা শিল্প হইতে তিনেরই উৎপত্তি। এইজন্য বৌদ্ধশিল্পে গ্রীক্‌ভাব দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্থির করেন যে, আর্য্যশিল্প গ্রীসের কাছে এবং জাপানশিল্প আর্য্যাবর্ত্তের নিকট ঋণী; কিন্তু, একই দেবতা, তাঁহারই যে এই ত্রিমূর্ত্তি, এ যে তিনই এক, একই তিন, কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়;—এ কথা ইউরোপকে বোঝান শক্ত; যে দেশের শিল্পী এখনও ধ্যানমূর্ত্তি গড়ে, সেই দেশের লোকই বুঝিয়াছে। জাপান বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া সে আপনার শিল্পের উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছে; শিল্প শিক্ষা করিতে সে ইউরোপের অভিমুখে ছুটে নাই; জাপানীশিল্প আজও নিজত্বটুকু বজায় রাখিয়াছে বলিয়া শিল্প জগতে তার স্থান আজ অতি উচ্চে।

গ্রীক্ পুরুষোত্তম সত্যপীররূপে ইউরোপে সিন্নি পাউন, জাপান জাপানশিল্প লইয়া থাকেন থাকুন; আমাদের যে শিল্প আমরা তাহা লইয়াই থাকি।

কথা উঠিতে পারে, আমাদের কিছু আর আছে কি? সব যে গেছে! এটা কি সত্য? যে ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পীকুল শ্রমকে শ্রমজ্ঞান করে নাই, যে বিশ্বাসের বলে সে একএকটা পর্ব্বত এক টুকরা-পাথর-জ্ঞানে কাটিয়া-কুটিয়া তাহা হইতে ইচ্ছামত বিচিত্র

মঠমন্দির সৃষ্টি করিয়াছে, পর্ব্বতের গুহায় গুহায় যাহারা অক্ষয় প্রদীপের ন্যায় মহোজ্জ্বল চিত্রশ্রেণী জ্বালাইয়া গিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আর আমাদের বিশ্বাসে কোন প্রভেদ আছে কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তখনও ছিল, এখনও আছে। যে জাতি সাঞ্চি স্তূপ গড়িয়াছিল, অজন্তায় চিত্র লিখিয়াছিল, সে জাতি পাতাল হইতেও উঠে নাই, আকাশ হইতেও পড়ে নাই; সে এখনও যে আর্য্য, তখনও তাই; ধর্ম্মের আদর্শ, সমাজের নিয়ম, শাস্ত্রের অনুশাসন এখনও সমান প্রচারিত—তবে কেন না আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের সমকক্ষ হই? আমাদের আদর্শের অভাব নাই—ব্রাহ্মণ্যযুগের, বৌদ্ধযুগের মন্দির মঠ এখনও বিদ্যমান, শিল্পশাস্ত্রও অপ্রচুর নয়, নিপুণতার বিজয়দণ্ড এখনও ভারতের হাতেই আছে; ইউরোপের ভ্রষ্টশিল্প মোহকুহকে কেবল আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে মাত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

"দেবানাং প্রতিবিম্বানি কুর্য্যাৎ"—দেববিম্ব গঠন করিবে—এই ঋষিবাক্য গভীরভাবে আমাদের কারুশিল্পীর মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। কারুশিল্পী বলিতে art-schoolএর ছাত্র বুঝায় না, যাহারা বংশপরম্পরায় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এখনও প্রতিমা গড়িতেছে, পট লিখিতেছে, সুবর্ণের টুক্‌রা হইতে স্বর্ণশতদল, শঙ্খখণ্ড হইতে বিচিত্র বলয়, বন্যপুষ্প হইতে দেবতার পুষ্পমুকুট, কুসুমালঙ্কার

রচনা করিতেছে; যাহারা শিশুকাল হইতে মাটিতে, পাথরে, সোনায়, রূপায় ধ্যানমূর্ত্তি গড়িয়া আসিতেছে, আমি তাহাদেরই কথা বলিতেছি। ঋষিবাক্য তাহারা এখনও অমান্য করে নাই এবং সেই কারণে তাহাদের শিল্পের অধঃপতন এখনও সুদূর। এ কথা যদি স্পষ্টতরভাবে চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে চাও, তবে আশ্বিনের সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টামুখরিত কোন দেবায়তনে আরতিপ্রদীপের আলোকতরঙ্গের মাঝখানে ধূপাচ্ছন্ন দুর্গাপ্রতিমার মুখের দিকে ভক্তিভরে চাহিয়া দেখিও, মহামায়ার কৃপায় মায়াকুহক দূর হইবে;—দেখিবে, এখনও এদেশীয় শিল্পী মাটির প্রতিমায় কি নিরুপম ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে এবং তুমি স্পষ্টই বুঝিবে, ধ্যানমূর্ত্তির মহত্ত্ব কোন্‌খানে, আর আর্য্যশিল্পের সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব কতটা।

শিল্পের ত্রিধারা

এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলিতে যাওয়াও যা আর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বৌদ্ধ শিল্পসম্বন্ধে বলাও কতকটা সেইরূপ ; —কেননা সেটার ইতিহাস এত জটিল ও বৃহৎ যে প্রাচ্য জগতের সমস্ত শিল্প ইতিহাস তাহার ভিতরে আসিয়া পড়ে। অতএব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই শিল্পের একটা ছায়াচিত্র মাত্র দিবার চেষ্টা করিব। জগৎ শিল্পে আমাদের ভারত বা বৌদ্ধশিল্পটা কোন স্থান অধিকার করে, আশা করি, সেটা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে।

হিন্দুকুশ হইতে সিংহল, উদয়গিরি হইতে গির্ণার পর্ব্বত, এই বিশাল ভারতখণ্ডের সমস্ত হৃদয়ের প্রেমরসে সিঞ্চিত হইয়া বোধিধর্ম্মদ্রুম—পূর্ব্বমুখে প্রশান্তমহাসাগরের পরপার, উত্তরমুখে চীন তাতারের শেষসীমা, পশ্চিমে তুরষ্ক স্থানের মরুপ্রান্তর, দক্ষিণে ভারতসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের উপরে, ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে ; আর সেই ধর্ম্মকল্পতরুকে পরিবেষ্টন করিয়া আমাদের শিল্পলতিকা মর্ত্ত্যে পারিজাত সুষমা বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছে ! ভারতের জাতীয় জীবনের এই প্রকাণ্ড, প্রশান্ত, প্রফুল্ল ছবি যে পুণ্যচরিত্র সাধু মহাত্মাগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ধন্য ;

আর আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে সেই পবিত্র চিত্র যদি আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় তবে আমরাও ধন্য হইব।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্মলাভ, বুদ্ধত্বলাভ মহাপরিনির্ব্বাণলাভ, তাহাতে যে কেবল তিনিই লাভবান হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, তিনি নিজের লাভ আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ধনের, যে স্পর্শমণির অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি একা না রাখিয়া আমাদেরও তাহার ভাগ, তাহার অধিকার দিয়াছেন; সেইজন্য তিনি জগতের নমস্য, আর সেই কারণে সহস্র সহস্র বৎসরের কালান্ধকার ছিন্ন করিয়া সেই নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র জগৎ-জনের হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া চিরদিন অক্ষয় শোভায় বিরাজিত আছেন।

জগতে ধর্ম্মবীরগণ ধর্ম্মচক্র অনেক প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনটি করিয়া কেহ নয়;—উচ্চ নীচে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীতে একান্ত সমতা ও প্রীতি তাঁহার প্রধান অস্ত্র। বুদ্ধদেব তাঁহার প্রচারক শিষ্যগণের নাম দিয়াছিলেন ভিক্ষু;—ভগবানের চিহ্নিত নয়, জগতের শিক্ষাগুরুও নয়!

তাঁহার শিষ্যগণ যখন দেশে বিদেশে তাঁহারই অমৃত বাণী বহন করিয়াছিলেন তখন সেই স্বর্ণ-কাষায়-বাস মহাত্মাগণের পুণ্যকর্ম্মের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধের বিকট কবন্ধ নৃত্য

করিতে করিতে চলে নাই ; চলিয়াছিল জ্ঞানের খরকরজাল, শিল্পসৌন্দর্য্যের আনন্দ দুন্দুভি, আর করুণার অপ্রতিহত শক্তি ! জ্ঞান ও করুণার মন্ত্রে ক্লেশ ভুজঙ্গকে তাঁহারা আমাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছেন, আর শিল্পসৌন্দর্য্যের পূর্ব্ববাতায়নপথে তাঁহারা আমাদের গৃহে পারিজাত সুরভি আনিয়া দিয়াছেন। পরমানন্দের এই দিব্য পরিমল, বিশুদ্ধ বৌদ্ধ শিল্পকে জগতে আর সমস্ত শিল্প হইতে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়াছে।

সেই সময়ের সামান্যমাত্র শিল্প চর্চ্চা করিলে দেখিতে পাই যে, সে যুগের শিল্পীরা শুধু যে নিপুণ কারিগর ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন। সেদিনও নেপালের ধর্ম্মরাজগণ যে হাতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন সেই হাতেই তুলিও ধরিয়া গিয়াছেন। এই সকল সাধক-শিল্পীর করস্পর্শে গিরিতুল্য বজ্রকঠিন প্রস্তরখণ্ডসকল দেবদুর্ল্লভ বুদ্ধমূর্ত্তিতে, সুকুমার পদ্মগুচ্ছে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

আমরা আজকাল যে সকল মন্দিরে উপাসনা করি, যে সকল সভাগৃহে সম্মিলিত হই, সেইগুলা গিরিগুহা-খোদিত যে-কোন-একটি ক্ষুদ্রায়তন বৌদ্ধবিহারের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন। আমাদের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলা প্রস্তুত করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, গিরিগুহাটি ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী করিতে যে তাহার অধিক ব্যয় হইয়াছিল

এমন মনে হয় না। তবে, কেন একটা সহস্র বৎসরের পরে ভগ্নদশাতেও সুন্দর, আর কেনইবা অন্যটা সদ্য নূতন অবস্থাতেও তাহার একটুকরা প্রস্তরেরও সমতুল্য নয়? যে শিল্পীগণ গিরিগুহাগুলা কাটিয়া মন্দির বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা আনন্দের খাতার হিসাব চুকাইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়,—ব্যাঙ্কের খাতার নয়।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধশিল্পটাকে ভারতে গ্রীকসভ্যতা ও গ্রীকপ্রভাবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন; কিন্তু যে সভ্যতা বা যে মনোভাবের উপরে গ্রীক পার্থিনানের ভিত্তি, আর যাহার উপরে অশোক-স্তম্ভের ভিত্তি তাহার পার্থক্য অনুধাবন করিলেই সকল সন্দেহ দূর হয়। আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক শিল্প, মানবসৌন্দর্য্য, মানব ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ, তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভশিখরে, হয় কোন গ্রীক দেবতা বা গ্রীক বীরের, নয়তো কোন উর্ব্বশী মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান; আর অশোকস্তম্ভগুলা মস্তকে অশোকমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গুরুজনে ভক্তি, সর্ব্বভূতে দয়া ইত্যাদি শাসনবাণী, আনন্দের অক্ষর বা ধর্ম্মচক্র লইয়া শোভা পাইতেছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, বৌদ্ধ শিল্প ধর্ম্মকল্পতরুকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রীসের ঐহিক সৌন্দর্য্যধ্বজাকে বেষ্টন করিয়া নয়।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; —কেননা এই ব্যবধানটুকু পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে

পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে প্রাচ্য শিল্পের প্রভেদটা আমরা ধরিতে পারি না; এবং সেইজন্যই ইউরোপীয় শিল্পের তুলনায় প্রাচ্য শিল্পটা পাশ্চাত্যরোগগ্রস্ত আমাদের চক্ষে ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ ও অপরিণত বয়স্কের ছেলেখেলা বলিয়া ঠেকে। মানব জীবনে আমরা তিন অবস্থা দেখিতে পাই,—বাল্য, যৌবন ও বয়স্থ। শিল্পেরও তেমনি তিনটা স্তর,—আদিম, মধ্য ও চরম। অবশ্য এখানে মানব জীবন বলিতে আদর্শ মানব বলিয়া বুঝিতে হইবে। শিশুকালে মানব সরল, আনন্দময়; যৌবনে সে ভোগসুখে, ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত; আর বয়স্থকালে তাহার জ্ঞানগভীর জীবনের আনন্দ নিবিড়তর হইয়া সে ক্রমে যেন পুনর্বাল্যে উপনীত হয়। সে সময় লোকটির চালচোল, ধরণধারণ মধ্য বয়সের মত নির্দ্দোষ, ঠিক্‌ঠাক্ থাকে না; হয়তো বা লোকটা কাশীর তৈলঙ্গ স্বামীর মত অশোভন আদুল গায়ে ধূলাকাদা মাখিয়া প্রচলিত সভ্যতার সমস্ত নিয়মবিরুদ্ধ অবস্থায় ঠিক পাঁচবৎসরের শিশুর খেলা সদানন্দমনে খেলিতেছে দেখি। শিল্পও তেমনি আদিম অবস্থাটায় বাঁধানিয়ম, দস্তুর বেদস্তুর, শোভন কি অশোভন, এসকলের ধার ধারে না,—দুই চারিটি কালির আঁচড়, কি এক পোঁছ রং লইয়াই তাহার আনন্দ এবং বালক-চেষ্টিতের মত তাহা মনোহর। মধ্য অবস্থায় শিল্প বাঁধানিয়মে টেরী বাগাইয়া, প্রচলিত দস্তুরমত সাজগোজে ফিট্‌ফাট হইয়া, সুনিয়মিত ভঙ্গিতে, সুপুরুষ বেশে দেখা দেয়। আর

বয়স্থ বা চরম শিল্পটা, ভোলা-মূর্ত্তি, নিয়মবন্ধনমুক্ত মহানন্দে মগ্ন দিগম্বর মুক্ত পুরুষ! এই চরম অবস্থায় যখন কোন শিল্প উপনীত হয় তখন তাহার নির্গুণত্বই গুণ হইয়া দাঁড়ায়। তখন যাহারা সে অবস্থার মর্ম্ম বোঝে না, তাহারা উপহাস করিয়া পাগলাটে বলিয়া মুখ ফিরায়; আর যাহারা বোঝে তাহারা শিল্পের সেই ভোলানাথ মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

আমার একথাটা শুনিয়া হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে যে, দেশীয় শিল্পটার দোষগুলা সমর্থন করিবার জন্য নির্গুণত্বই-গুণ-গোছের একটা বেশ ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করিয়াছি। কিন্তু তাহা নয়। শিশুর বাল্যভাবে যে অক্ষমতার লক্ষণ, মহাজ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষিগণের বাল-স্বভাবে কি সেই অক্ষমতার লেশমাত্র দেখিতে পাই? তেমনি আফ্রিকার আদিম শিল্পে যে অক্ষমতা ভারতবর্ষের আর্য্যগণের শিল্পে কি সেই অক্ষমতা? আমাদের শিল্পে যে বালকত্ব দেখা যায় তাহা শিল্পীগণের নিপুণতার অভাবে নয়, কলালক্ষ্মীর একান্ত সাধনার ফলেই সেরূপটা ঘটিয়াছে। রুচিভেদে, জাতি-ভেদে শিল্পের এই ভোলারূপ নয়নতৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু যে শিল্প যখনই শিল্পের উর্দ্ধতম অবস্থায় উন্নীত হইবে তখনই তাহার এই দশা ঘটিবে। Art seems to reach its highest and to go deepest when all that is small and common is excluded. হ্যাভেল সাহেব বলিতেছেন,—"শিল্প তখনই চরম অবস্থায় উন্নীত

হয় এবং তখনই তাহাতে গভীরতা আসে যখন তাহা হইতে যা কিছু সাধারণ প্রচলিত ও সঙ্কীর্ণ তাহা দূর হয়।"

রাস্কিন্ সাহেব বলিয়াছেন,—'Men who have no imagination, but have learned merely to produce a spurious resemblance of its results by the recipes of composition, are apt to value themselves mightily on their concoctive science ; but the man whose mind a thousand living imaginations haunt, every hour, is apt to care too little for them ; and to long for the perfect truth which he finds is not to be come at so easily.'

"যাহাদের কল্পনাশক্তির অভাব কিন্তু যাহারা কতকগুলা প্রচলিত নিয়মের প্রক্রিয়া দ্বারায় কল্পনাপ্রসূত পদার্থের একটা মেকি বানাইতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিজেদের সেই মেকি প্রস্তুত প্রকরণ ও প্রণালীগুলাকে মূল্যবান জানিয়া গর্ব্ব অনুভব করে ; আর যাহাদের মন কল্পনার লীলাভূমি, প্রকরণ-প্রণালীর উপরে তাহাদের আস্থা থাকে না ; তাহাদের মন দুর্ল্লভ সত্যের দিকেই ধাবিত হয় এবং তাহারা জানে প্রকরণপ্রণালীর সহজ উপায়ে সেটাকে ধরিবার উপায় নাই।"

সত্য শিল্পে নিয়মের বন্ধন, দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না

থাকাই যে শ্রেয় একথা কি রাস্কিন্, কি হ্যাভেল, কি আর কেহ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল আমরাই হায় রে Perspective, হায় রে Anatomy, কোথায় Reality করিয়া মরিতেছি!

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতশিল্পটা কোন অবস্থায় ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, কেননা তাহার পূর্ব্বেকার কোন মন্দির, মূর্ত্তি কিম্বা চিত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না; কিন্তু সে শিল্প যে আদিম, মধ্য, ও বৌদ্ধযুগে চরম অবস্থায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, এটা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না।

অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধযুগের শিল্প প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে একটা পৃথক বস্তু; কিন্তু আমি তাহা বলি না। একই মানুষ যেমন প্রথমে শিশু, পরে রাজা, শেষে শিশুর ন্যায় সরল, মুক্ত, সদানন্দ, দিগম্বর, ভোলানাথ, ঋষি মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে দেখিতেছি, তেমনি একই ভারতশিল্প ক্রমোন্নতির নিয়মে শিল্পের এই চরম অবস্থায় না আসিয়াছে তাহাই বা কে বলিবে? তাহা ছাড়া কি ইউরোপীয়, কি ভারতবাসী, যিনিই ভারতশিল্পের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন তিনিই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হস্তের নিপুণতায় ভারতশিল্পী জগতের কোন শিল্পীরই কাছে হার মানে না! তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের শিল্পে ফিট্‌ফাট্ গঠনের অভাবের কারণ অনৈপুণ্য নয়,

অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুটা কি? ইউরোপীয় জাতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিবেন, প্রাচ্যজাতি মাত্রেরই কেমন একটা মানসিক বৈকল্য আছে, যাহাতে করিয়া সৌন্দর্য্যের যে স্তরে একজন গ্রীক্ বা পাশ্চাত্য শিল্পীর মন পৌঁছিতে পারে সে স্তরে প্রাচ্য শিল্পীর মন উন্নীতই হইতে পারে না। এই যুক্তিটার যেমন এ-পিঠ আছে তেমনি ও-পিঠও আছে। পশ্চিমের দিক দিয়া দেখিলে আমরা দেখি, গ্রীক্ শিল্পের কাছে আর্য্যশিল্প ঘেঁসিতে পারিতেছে না; আবার পূবের দিক দিয়া দেখিলে দেখি, গ্রীক্ শিল্প আর্য্যশিল্পের ত্রিসীমানায়ও আসিতে অক্ষম। এখন বিচারের বিষয় দাঁড়াইতেছে যে, শিল্পের কোন স্তরটা উর্দ্ধতন বা লোভনীয়। অবশ্য পশ্চিমের লোকেরা গ্রীক্ শিল্পটাকে শিল্পের চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আবার ইহাও দেখি, জগতের বারো আনারও অধিক লোক এই প্রাচ্য শিল্পটার দিকে! দলে ভারি যে আমরা তাহার সন্দেহ নাই। এখানে পশ্চিমের লোকেরা বলিবেন,—'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি, ন চ তারাগণৈরপি', এবং পূর্ব্বের গ্রীক্‌গ্রস্ত লোকেরাও ঐ এক যুক্তিতেই আমাদের মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তারাগণ কি এরূপ বলিতে পারে না যে, —দেখ, চন্দ্রটা তোমাদের নিকট-আত্মীয়, তাহার আলোকটাও তোমাদের কাছে অধিক পৌঁছিতেছে; আর আমরা, তুমি যে লোকের জীব সেখান হইতে কোটী

কোটী যোজন দূরে, অবস্থিত ; আমরা আলোকও দিতেছি লোকান্তরে ; কাযেই তোমাদের চক্ষে তারাগণের জ্যোতি ক্ষীণবোধ হওয়া অসম্ভব নয় ; কিন্তু বল দেখি, আজ যদি সমস্ত তারা মুছিয়া গিয়া আকাশ চন্দ্রময় হইয়া যায়, তবে বিশ্বশিল্পীর শিল্পরচনায় সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার ব্যাঘাত ঘটে না কি ?

তোমার রুচি অনুসারে তুমি চন্দ্রময় দ্যুলোকের মত শিল্পাকাশটা গ্রীক্ মূর্ত্তিময় দেখিলে খুসি হইতে পার, কিন্তু লোকাঃ যে ভিন্নরুচি—শিল্পও যে বিচিত্রতামূলক, তাহার কি করিলে ? অতএব ভারতশিল্প গ্রীকশিল্পের সহিত বা প্রাচ্য শিল্পীর মনের গতি পাশ্চাত্য শিল্পীর মনের গতির সহিত তুলনা করিয়া ছোটবড় বিকল অবিকলের হিসাব করিতে যাওয়াও যা, আর রাজদর্শনের পর সন্ন্যাসী মহাপুরুষের দর্শনে তাঁহার গায়ে রাজবেশের পরিবর্ত্তে বাঘছাল, চন্দনের পরিবর্ত্তে শ্মশান-ভস্ম, রত্নমালার স্থানে হাড়মাল এবং ভোগপুষ্ট নধর গঠন, কেতা-দোরস্ত চালচোল ভাবভঙ্গীর পরিবর্ত্তে কাষ্ঠবৎ দেহগঠন, অশোভন ভাবভঙ্গী দেখিয়া মহাপুরুষকে ধিক্কার দিয়া ফিরিয়া যাওয়াও তা। ইহাতে আর কাহারও কিছু ক্ষতি হইল না তুমিই দেবদুর্ল্লভ দর্শনে বঞ্চিত হইলে।

রজোগুণ আর সত্ত্বগুণে যে প্রভেদ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-শিল্পে ঠিক সেই প্রভেদ। সেইজন্য রজোগুণপ্রধান

পাশ্চাত্যশিল্প অবয়বের বাঁধন, কেতাদোরস্ত চালচোলের নিয়ম মানিয়া চলে; আর সত্ত্বগুণপ্রধান ভারত বা বৌদ্ধ শিল্পের ঐ সকল নিয়ম মানিয়া চলার দিকে দৃক্‌পাতও নাই। লক্ষ্য হিসাবে দেখিতে গেলে বৌদ্ধশিল্প, শিল্পের উচ্চতর লোকে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয়; কেননা কি কাব্যে, কি শিল্পে, কি মানবের চরিত্রে সাত্ত্বিকভাবেরই প্রাধান্য চিরদিন পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টিসংস্থাপনের জন্য যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণই অত্যাবশ্যক, শিল্পের পক্ষেও ঐ গুণত্রয়ের তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু জগতে কোন এক শিল্পে এই ত্রিগুণের একত্র সমাবেশ এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। হর-গৌরী, হরি-হর এইরূপ দুইগুণের একত্র সমাবেশ শিল্পে ঘটিয়াছে, কিন্তু হরি-হর-ব্রহ্ম এরূপটা আমার চক্ষে এপর্য্যন্ত পড়ে নাই; তবে জগতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন শিল্পের একত্র চর্চ্চা করিতে করিতে শিল্পের ঐ বিরাট মূর্ত্তির ছায়া মনে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে।

আমাদের শিল্পকারগণ প্রতিমা সকলের তিন লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন,—"সাত্ত্বিকী রাজসী দেবপ্রতিমা তামসী ত্রিধা।" সাত্ত্বিকী প্রতিমা হচ্চেন,—'যোগমুদ্রান্বিতা'; রাজসী—'নানাভরণভূষিতা' আর 'উগ্ররূপধরা' হচ্চেন তামসীপ্রতিমা।

এই তিন গুণ যেমন পৃথক পৃথক প্রতিমায় দেখা যায়,

তেমনি দেখি জগতের প্রাচীনতম তিনটা শিল্প,—ইজিপ্ত, ভারত, আর গ্রীক এই তিন গুণের সুস্পষ্ট তিনটা মুদ্রা প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচীন ইজিপ্তের যে সভ্যতা সর্ব্বগ্রাসী কালের সম্মুখে দম্ভভরে রাজদণ্ড উত্তোলন করিয়া মৃতদেহকে অবিনশ্বরতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, কালের প্রতাপকে রাজপ্রতাপের কবলে আনিয়া মর্ত্ত্যকে অমরত্ব দিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই প্রভুত্ব তামস প্রাচীন সভ্যতার শিল্প-নিদর্শন নীলনদীতীরে নির্ব্বাপিত ইজিপ্ত রাজশ্রীর মরুশ্মশানে কালবিজয়িনী বিভীষণা বিস্ময়করী নারীসিংহের তামসী মূর্ত্তি!

আর যে গ্রীক সভ্যতা কুস্তিগিরের খেলাকে (olympic games) অমর লোকের ক্রীড়া নাম দিত; ভোগানন্দে যে গ্রীক্ জাতি নরদেহে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে তাহাদের শিল্প ইন্দ্রাণীতুল্য, শুভ্র মর্ম্মরে রাজসী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা।

আর যে ভারত বৌদ্ধ বা প্রাচ্য সভ্যতা মায়ার মূল, দুঃখের মূল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমানন্দ-সাগরে নির্ব্বাণ-লাভ করিতে ব্যস্ত; যে যুদ্ধ করিয়া ইতিহাস লিখিবার বেলায় তারিখ, সৈন্যসংখ্যা হতাহতের তালিকা ঠিক না রাখিয়া অভিরাম দেবচরিত্র বর্ণন করিয়া যায়; যে একচ্ছত্রী সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি না রাখিয়া, করুণার

অনুশাসন ধর্ম্মের অসংখ্য কীর্ত্তিস্তম্ভে জগতের বৃহত্তর সাম্রাজ্য-খণ্ডকে নিরবচ্ছিন্ন মণ্ডিত করিয়া তোলে তাহার আর্য্য-শিল্পের সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত ভাবঘন ধ্যানস্তিমিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি পার্থিব সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পদ্মাসনে চরণ স্থাপন করিয়া প্রকাশিত আছেন। তিন প্রাচীন শিল্পের ঐ ত্রিধারা যে আবহমানকাল আপনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে এমন নয়; দেশকালভেদে সেটাতে অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়,—যেমন রাজসিক গ্রীক্ শিল্পে প্রথমে তামসিক রোমান, পরে সাত্ত্বিক খ্রীষ্টীয়, শেষে জড়প্রধান ইউরোপীয় শিল্প; ও সত্ত্বগুণপ্রধান আর্য্যশিল্পে তামসী তান্ত্রিক ও রাজসিক মোগল শিল্প আসিয়া মিলিয়াছে।

এই ত্রিগুণের কষ্টিপাথরে তাবৎ শিল্পকে কষিয়া দেখিলে মোটামুটি দরের হিসাবটা এইরূপ দাঁড়ায়:—

ইজিপ্ত শিল্প—বিশুদ্ধ তামসিক, দর ১৬৲ টাকা। যে খনিতে এ সোনা জন্মিত তাহা এখন বর্ত্তমান নাই, নীল নদীর চড়ায় ঢাকা পড়িয়াছে, তবে ভারতের বিশুদ্ধ তান্ত্রিক সোনাটা ইহার সমতুল্য।

গ্রীক শিল্প—বিশুদ্ধ রাজসিক দর ১৬৲ টাকা। রোম্যান আমলে উক্ত সোনা তমাশ্রিত রাজসিক দর ১২৲ টাকা। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে উহা রজাশ্রিত সাত্ত্বিক ও সাত্ত্বিক দর ১৬৷৷০ ও ১৮৷৷০ টাকা। অধুনাতন উহা রজতামসী, কেমি-কেল বা নিকেল, দর এক কড়া।

আর্য্যশিল্প—পহিলা খানের সোনা অপ্রাপ্ত। বৌদ্ধ-যুগে অতিবিশুদ্ধ সাত্ত্বিক, দর ২০৲। ব্রাহ্মণ্য যুগে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ও তামস সাত্ত্বিক দর ১৮৷৷০ টাকা। মোগল আমলে রজাশ্রিত সাত্ত্বিক ও তমাশ্রিত রাজসিক দর ১৬৷৷০ ও ১২৲ টাকা।

অধুনাতন, এদেশের লোক ইউরোপ হইতে কেমিকেল আনাইয়া ব্যবহার করিতে শিখিয়া আর নিজের খনিতে কায করিতে চাহেনা,—বিশেষ যাহারা সভ্য হইয়াছে; কেননা তাহাদের জ্ঞান, সেরূপ করিলে সভ্যতা রক্ষা হয় না। অতএব সোনা এখন এদেশে দুষ্প্রাপ্য।

বৌদ্ধশিল্পটা কোনভাবে অনুপ্রাণিত তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি এবং সেটাকে কোন দিক দিয়া বুঝিতে হইবে তাহাও বুঝিতে বাকি নাই। এখন ভারতবর্ষে এই বৌদ্ধ শিল্পের মন্দিরাদির একটা চুম্বক তালিকা ও তাহাদের স্থানকাল নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমে, স্তম্ভ বা লাঠ। বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ে এগুলির উপরে অনুশাসন লিপি, শিখরদেশে চারি সিংহমূর্ত্তি,—যেন পশুস্বভাব ছাড়িয়া তাহারাও করুণার মহিমা কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছে। জৈন ধর্ম্মে এইগুলি দীপদানরূপে কল্পিত; ভাবটা—ধর্ম্মের জ্যোতি মর্ত্ত্যলোক আলোকিত করিয়া যেন দেবতাগণকেও আলোক প্রদান করিতেছে।

বৈষ্ণবেরা এই লাঠস্তম্ভের শিখরে গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এটাকে গরুড়স্তম্ভ বা ভগবৎপ্রেমে দাস্যভাবের আদর্শ মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া মন্দির সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখিতেছি, তিন কালে উক্ত তিন ধর্ম্মই লাঠস্তম্ভের লক্ষ্য বজায় রাখিয়াছে।

ধর্ম্মাশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ৩১ বৎসরে এই লাঠস্তম্ভসকল ভারতের নানা স্থানে প্রথম প্রোথিত হয়। দিল্লীতে ফিরোজ সাহের কবর সম্মুখে একটি ধাতুনির্ম্মিত ২৩ ফিট উচ্চ স্তম্ভ আছে, সেটি খৃষ্টীয় ৩০০-৪০০ শতাব্দিতে রচিত। এই লাঠে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সেটা একটা গরুড়স্তম্ভ; ইহার গঠন পারিপাট্য চমৎকার। ধাতু নির্ম্মিত এতবড় স্তম্ভ ইউরোপ অতি অল্প দিনই হইল গড়িতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রয়াগের দুর্গমধ্যে যে ৩৩ ফিট উচ্চ প্রস্তরগঠিত অশোকস্তম্ভ আছে সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। তাহার উপরে ৩৮০-৪০০ খৃঃ অব্দে সমুদ্র গুপ্তের এবং ১৬০৫ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর বাদসাহের জয়গাথা ধর্ম্মাশোকের অভয় বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; এবং গান্ধার দেশের গ্রেকো-রোম্যান বা তমাশ্রিত রাজসিক-শিল্পের Honey Suckle মধুলতিকার মাল্যদাম ইহার শিরোভূষণে জড়াইয়া গিয়াছে।

কাবুলের সুরুখ্ মিনার, পুরীর গরুড়স্তম্ভ, হিমালয়ের

পার্ব্বত্যপ্রদেশে ভুটিয়াদের পতাকা ও মন্ত্রপত্রিকা-পরিশোভিত বংশদণ্ডগুলি এই লাঠ স্তম্ভেরই পরিবার।

তাহার পরে চৈত্য ও বিহার। চৈত্যগুলা উপাসনা বা সভাগৃহ; আর বিহারগুলা ভিক্ষুগণের আবাসস্থানরূপে কল্পিত। ক্রীশ্চিয়ানদিগের চার্চ্চগুলির যে কাজ চৈত্যেরও সেই কাজ এবং খৃষ্টীয় convent বা monastery গুলির যে কাজ বিহারগুলিরও সেই কাজ ছিল। এই চৈত্য ও বিহারগুলি নির্ম্মাণসাদৃশ্যে খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও convent গুলার সহিত হুবহু মেলে। যদিচ খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা হইতে সেগুলা নকল করা হয় নাই। এইরূপ চৈত্য ও বিহার ভারতবর্ষে অসংখ্য। উদয়গিরির রাজরাণী গুম্ফা প্রাচীনতম, ও অজন্তা, ইলোরা, করালী প্রভৃতি বোম্বাই অঞ্চলের বিহারগুলি শিল্পহিসাবে শ্রেষ্ঠতম বলা চলে। এই-গুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় ৫ হইতে ৭ শতাব্দির মধ্যে ধরা যায়। এই অজন্তা-বিহারের চিত্রাঙ্কন প্রথা, আর বুদ্ধের ধর্ম্মরাজ্যের সীমাপ্রান্তে জাপানের 'নারা' মন্দিরের ভিত্তিচিত্রণপ্রণালী এবং আন্দাজ ৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের বঙ্গদেশে পুঁথি-আচ্ছাদনের জন্য যে কাষ্ঠ পাটা বা ফলক সকল ব্যবহৃত হইত তাহার রঞ্জন ও চিত্রণ একই। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেছে অথচ সেদিনও বাঙ্গালী সেই অজন্তা প্রথামত ছবি লিখিয়াছে, আজিও নেপাল তাহার শিক্ষা মানিতেছে, জগতে কোনো চিত্র-শিল্পের এ জীবনীশক্তি দেখা

যায় না। বৌদ্ধ-কলালক্ষ্মী অনেকদিন আমাদের পল্লীকুটীরে বাস করিয়া গেছেন ; তাঁহার সহস্র দল পদ্মাসনের সু-বর্ণ দলটি আমাদের পিতামহেরা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে অনেকদিন যত্নে রাখিয়াছিলেন ;—যতদিন না আমরা লক্ষ্মীপূজার কড়ি বন্ধ করিতে এবং ঝাঁপিটাকে waste paper basket রূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলাম।

বৌদ্ধযুগের স্তূপ ও মন্দির সকল ভগবান বুদ্ধের দেহ-অস্থি রক্ষণের ও তাঁহার চরণধূলিতে পবিত্র তীর্থস্থান সকলকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। তাহার মধ্যে বুদ্ধগয়ার মন্দির, বরহাট স্তূপ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০—২৫০ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুই মন্দিরে গ্রীক্ বা রোমক্ শিল্পের গন্ধমাত্র নাই। তাহার পরে প্রথম খ্রীঃ অব্দে সাঞ্চি স্তূপ, তাহার ৫০০ বৎসরের মধ্যে গান্ধার, এবং ৪০০ হইতে ৫০০ খৃঃ অব্দে অমরাবতী স্তূপ নির্ম্মিত হয়।

এই বরাহট ও সাঞ্চি স্তূপের কারুকার্য্য হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধেরা তখনও বুদ্ধমূর্ত্তির স্থাপনা করেন নাই। সে সময়ের শিল্পীরা বুদ্ধচরণ, ধর্ম্মচক্র, এমন কি নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দিয়া স্তূপদ্বয়ের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন, কুমার সিদ্ধার্থের জীবনের ঘটনাও খোদিত করিয়া গেছেন কিন্তু কোথাও উপাসিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। সাঞ্চিস্তূপে বুদ্ধজাতক সকল চিত্রিত করিয়া প্রাচীরগাত্রে জীবজন্তু পশুপক্ষী এমন সুন্দর করিয়া খোদিত

আছে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তৎকালিক জগতের কোন দেশের প্রস্তর-উৎকীর্ণ পশুপক্ষীগুলি ইহার সমতুল নয়।

খৃঃ অব্দ চারি কি পাঁচশতবৎসরের মধ্যে অমরাবতীর স্তূপ গঠিত হয়। এই স্তূপে আমরা বুদ্ধমূর্ত্তি সকলের প্রথম দর্শন-লাভ করি। শিল্প হিসাবে ভারতে যত স্তূপ আছে তাহার মধ্যে অমরাবতী স্তূপই শ্রেষ্ঠ। আক্ষেপের বিষয় কৃষ্ণানদীতীরে এই স্তূপটি যেমন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন আর কোনটিই নয়। মান্দ্রাজ ও ইউরোপের শিল্পশালাসমূহে ইহার যে খণ্ড প্রস্তর সকল রক্ষিত আছে তাহা কি অপূর্ব্ব সুন্দর! মনে হয়, বরহাট ও সাঞ্চি স্তূপে শিল্প, আনন্দের কাকলী মাত্র সুরু করিয়াছে, এইখানে সে একেবারে শঙ্খঘণ্টারবে মহা বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছে!—এতদিন তাহার উপর দিয়া স্বর্গের পরিমল বহিয়া যাইতেছিল, এইবার যেন দেবতা আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন। ভারত-শিল্পের এই পরমানন্দের বিরাট উচ্ছ্বাস, সাগরাম্বরা যবদ্বীপের সপ্ততল বরভূধর স্তূপের সুষমায় প্রাচ্যশিল্পের কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করিয়াছে। চিত্রশিল্পে অজন্তাগুহা আর ভাস্কর্য্যে এই বরভূধর স্তূপ, বৌদ্ধশিল্প বা প্রাচ্যশিল্প বা আর্য্যশিল্পের চন্দ্রসূর্য্যপ্রভ মুকুটমণি, নয়নের দুই তারা অথবা হরগৌরী—যুগল সাত্ত্বিকীমূর্ত্তি!

এই সপ্ততল প্রকাণ্ড বরভূধর স্তূপের তলদেশ হইতে

শিখর পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডে ভগবান বুদ্ধের সমস্ত জাতক, জন্ম-বিবরণ সুনিপুণ ভাস্করগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তীর্থযাত্রীগণের শিক্ষালাভের জন্য উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক একখানি প্রস্তরখণ্ড পরে পরে সাজাইয়া গেলে, সেগুলি লম্বে দেড় ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সমস্ত পাশ্চাত্য ভাস্কর্য্য শিল্পের কেন্দ্রস্থলে যেমন গ্রীক পার্থিনানের পার্থিবরূপ, বিরাট প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে বরভূধরের বররূপ সেইপ্রকার সুমেরুর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার বর্ণনে বাক্য হার মানে, দর্শনে চক্ষু সার্থক হয়!

ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ইতিহাস একটা অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অসম্ভব; কেবল ভারত চীন ও জাপান এই তিন দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও শিল্পের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে প্রচলিত একটি ক্ষুদ্র গল্প হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

লোয়াং নামক স্থানে তিন তীর্থযাত্রীর দেখা। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা ভারতসন্তান, দ্বিতীয় জাপান-বাসী আর তৃতীয় চীন হইতে আগত। তিন মহাত্মার যখন দেখা তখন চীনদেশীয় মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ এই যে আমাদের মিলন এটি দেখিতে হইয়াছে ঠিক যেন জাপানী বন্ধুর হাতের পাখাখানি! চীনটা যেন পাখার কাগজ,

ভারতবর্ষ হইয়াছে যেন পাখাখানির ঠাট বা পঞ্জরের কাঠিগুলি, আর ছোট দেখিতেছ এই যে জাপান উনি হচ্ছেন এই পাখার খিল বা ক্ষুদ্র বাঁধন ;—দেখিতে ছোট কিন্তু কাজে খাট নন।”

বিনা কাগজে শুধু কাঠি, পঞ্জর বাতাস দেয় না, বিনা কাঠিতে শুধু কাগজ উড়িয়া ছিঁড়িয়া যায়, আর বিনা খিলে পাখা খানা এলাইয়া পড়ে ও কাজেই আসে না।

চীনের এই লোয়াং সহরে এককালে তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দশ সহস্র ভারতীয় গৃহস্থ বাস করিতেন। ইহাদেরই প্রভাবে চীন ভাষায় শব্দতত্ত্ব প্রথম প্রচলিত হয় এবং তাহারই ফলে ৪০০ খৃঃ অব্দে আধুনিক জাপানী ভাষার সৃষ্টি। এই ত্রয়োদশ সহস্র ভারতবাসী সে সময়ের চীন শিল্পে যে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পাচার্য্য শ্রীমৎ ওকাকুরা সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নালন্দা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল বৌদ্ধ শিল্প-বিদ্যালয় ছিল সেখানে যেমন শাস্ত্রের চর্চ্চা, তেমনি শিল্পেরও চর্চ্চা চলিত। সেখানকার আচার্য্যগণ শিল্প সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র ও ব্যবস্থা প্রচলন করিতেন তাহা প্রাচ্য জগতে সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারাই প্রসার লাভ করিত। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের জ্ঞান চর্চ্চার স্থান ছিল ; সে সময়ের art facultyতে artটা এখনকার মত একটা optional বা খামখেয়ালী অস্থায়ী পদ অধিকার করিয়া ছিল না।

আর্ট ও আর্টিষ্ট

আমাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি কর" ? তবে আমরা বলিয়া থাকি—"আমি Artist." একথা বলিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না ; কেন না যখন ঘটিটা, গেলাসটা, মানুষটা, গরুটা, ঘর বাড়ি, গাছ পালা, ফুল পাতা দেখিলেই আঁকিতে এবং না দেখিয়াও আঁকিতে পারি, তখন কেনই বা আমি Artist নই।

জিনিষটা অবিকল আঁকা কম ক্ষমতার কাজ নয় সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতাটুকুই যে আমাদের artist নামের যোগ্য করিবে, এমনই বা কি কথা আছে ?

কবি তুলসীদাস বলিয়া গেছেন ঃ—পাতা খেয়ে থাকিলেই যদি তপস্বী হয়, তবে আমার কালো গাইটি তো ঘোরতর তপস্বিনী ?

আজন্ম রং তুলি লইয়া ঘাঁটা ঘাটি করিলে রং ফলানো এবং তুলি টানার বিশেষ দক্ষতা জন্মিতে পারে, কিন্তু শিল্পের ধ্রুব-লোক হইতে তুমি যে দূরে সেই দূরেই রহিবে।

হাতের লেখাটুকু ভাল হইলে আমি লিপিকার বলিয়া পরিচয় দিতে পারি, সুলেখক কিম্বা সুকবির কাছে ঘেঁসিতে পারি কি ? যোগের কতক আসন অভ্যাস করিয়া পরম

যোগী বলিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া, আর Art schoolএর certificate লইয়া artist বলিয়া পরিচিত হইতে যাওয়া, একইরূপ দুষ্কর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

Art school, artist গড়িতে পারে না, artistএর হাতের সরঞ্জম যোগাইতে পারে মাত্র। আগে artist হও, তবে Art schoolএ আসিও; লোকের কথায় ভুলিও না। যে বলে—"আমার Schoolএ পড়িলে তুমি বছর কয়েকের মধ্যে Artist হইয়া, বাহির হইবে," সে তোমায় প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিও। কথাটা যেন কেমন বিপরীত রকমের ঠেকিতেছে—রাম না হ'তে রামায়ণের মত। কিন্তু তলোয়ার ধরিবার আগে সাহসী হওয়া প্রয়োজন,—কাব্য লিখিবার আগে ভাবুক হওয়া চাই—এটা যখন আমরা বুঝি, তখন তুলি ধরিবার আগে artist হইতে হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? যাহারাই তুলি ধরে তাহারাই যে artist এটা যেন আমরা মনে স্থান না দিই।

রসগ্রাহীতা, ভাবুকতা, বিচারশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, উৎসাহ, একাগ্রতা, সংযম, জ্ঞান-পিপাসা, স্বদেশের প্রতি একান্ত অনুরাগ, এবং চিত্র-করণে নৈপুণ্য—এম্‌নি বহু গুণ লইয়া artist এর সৃষ্টি হয়। কুলীনের পক্ষে কুললক্ষণ যেমন নবধা, তেমনি artist এর লক্ষণও বহুধা বলিলেও বলা যাইতে পারে। বহু সাধনায় বহু জ্ঞানলাভ না করিলে artist হওয়া দুষ্কর।

সংসারে কোন জিনিস কেহ কখন বিনা আয়াসে লাভ করিতে পারে না। "অঙ্কন-বিদ্যা" যাহাকে drawing বলি, সেটা চুম্বক পাথর নয় যে সেটার জোরে আমরা Art জিনিসটাকে অবহেলে টানিয়া লইব!

লঙ্কার রাবণ গায়ের জোর লইয়া কৈলাসসমেত মহাদেবকে উঠাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারিয়াছিল কি? নিজেই কেবল কতকগুলা ধূলা কাদা মাখিয়া একে রাক্ষস তায় ভূত সাজিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল। আর যখন সেই রাবণ ভক্তিভরে গদ-গদ স্বরে প্রাণপণে চণ্ডিকার কৃপাভিক্ষা করিয়াছিল, তখন তো কৈলাসপতির আসন টলিয়াছিল বটে! কেবল গায়ের জোর লইয়া মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়ানো, আর শুধু তুলি কম্পাসের ধনুর্ব্বাণ লইয়া শিল্পজগৎ জয় করিতে যাওয়া, একই রকমের ধৃষ্টতা!

তুলি, কম্পাস মহাস্ত্র বটে, কিন্তু তাহাদের প্রয়োগের মন্ত্র গুলাও সঙ্গে সঙ্গে না শিখিলে, কি হইবে?

চিরদিন বসিয়া হাতের লেখাই পাকাইলাম কিন্তু হরির দুটো স্তব রচনা করিয়া যাইতে পারিলাম না, এরূপ হইলে জীবনের যে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হইয়া যায় তাহা আর দুইবার করিয়া বলিতে হইবে কি?

একান্ত ব্যাকুলতা লইয়া ধ্রুব যখন হরির সন্ধানে বাহির হইল,—হরি তখন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে, গহন-বনে, শার্দ্দূল-গহ্বরে, অগ্নিতে, জলে, সর্ব্বত্র বালককে রক্ষা

করিতেছেন, কিন্তু পশ্চাতে থাকিয়া ; দেখা দিতে বা ধরা দিতে মোটেই রাজি নন। আবার সেই বালক নারদের উপদেশে যখন দীক্ষিত হইয়া, কঠোর যোগ অবলম্বনে একাগ্রতার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা, ভক্তি সাধনায় সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিল, তখন হরি আর লুকাইতে পারিলেন না, ধরা তাঁহাকে দিতে হইল! শুধু ধরা দেওয়া নয়, হাতে হাতে রাজত্ব ও তার উপর অন্তিম কালে আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া একটা নূতন লোকই সৃষ্টি করিয়া দিতে হইল।

শিল্প দেবতা কোথাও না কোথাও আছেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে হইলে অনেক সাধনা—শুধু রং তুলির সাধনা নয়—সাহিত্য কাব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতির বহু সাধনার প্রয়োজন।

ছেলের পিতা মাতা "ছেলেটির কিছুই হইল না" দেখিয়া Art-Schoolএ দিয়া নিশ্চিন্ত হন ; ছেলেটিও যদি Art এর সঙ্গে লেখা পড়ার কোন সম্পর্ক নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহে,তবে তাহার ভাগ্যে হরিদর্শন ঘটা অসম্ভব। আর ছেলেটি যদি বোঝে যে, যে ব্যক্তি M.A. পাশ করিয়া কেরাণী হইতে চলিয়াছে, তাহার কাছে দেশবিদেশের ইতিহাস, রসায়ন বিদ্যা, কাব্য, অলঙ্কার, দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি যত না প্রয়োজন, আমি artist হইতে চলিয়াছি আমার কাছে এগুলা ততোধিক প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য শিক্ষণীয়, তবে আর কোন গোল থাকে না।

বাস্তবিক আমরা Artটাকে তুচ্ছ করিয়া, খেলিবার সামগ্রী করিয়া দেখি, সেই জন্যই শুধু আমাদের Artকে নয় আমাদের নিজেকে পর্য্যন্ত লোকচক্ষের হেয় করিতেছি।

আদালতের উকিল, কৌন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow, স্কুলের Head Master, আফিসের বড়বাবু, কিম্বা রাজা মহারাজার অপেক্ষা এক জন Artist কে যে কিছু কম লিখিতে পড়িতে কিম্বা জানিতে শুনিতে হয় এমন তো বোধ হয় না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থামত যে-কয়টা ভাষা ও বিষয় শিক্ষা করিয়া M. A. B. A. উপাধি লইয়া আমরা সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হই, artist হইতে হইলে তাহা অপেক্ষা কিছু কম শিখিলে তো চলেই না, উপরন্তু আরও অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতার দরকার।

ইতিহাসের প্রশ্ন লিখিতে পাশকরা ছোকরা তারিখ কয়টা রাজার ও দেশের নাম কয়টা জানিয়াই খালাস, কিন্তু একজন artist এর তাহা হইবার জো নাই, তাহাকে সে সময়ের রীতিনীতি, কাপড়গহনা, বাড়িঘর, গাছ পালা, লোকের চেহারা, ধরণ ধারণ প্রভৃতি কত বিষয়েই না অভিজ্ঞ হওয়া চাই, রীতিমত না পড়িলে শুনিলে জানিলে দেখিলে artist বলিয়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব।

বন্দুক ছুঁড়িতে কিম্বা তলোয়ার চালাইতে নেপোলিয়ান যে তাঁহার একজন সৈনিকের অপেক্ষা বেশি দক্ষ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু দূরদৃষ্টি, চতুরতা, সাহস, উৎসাহ, বুদ্ধি-

কৌশল, রাজনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদিতে তিনি তাহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে ছিলেন; তবেই না তিনি ফ্রান্সের সম্রাট এবং অর্দ্ধপৃথিবীর হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুধু তুলি রং এর শিক্ষা শিক্ষা নয়,—আমাদিগকে অনেক বিষয়ে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। এই সুশিক্ষার জন্য আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন্না দিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। আর এখন ধন্না দিলেও ফল নাই, কেন না বিমাতার হস্তে রামচন্দ্রের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ অযোধ্যা হইতে শিল্পদেবতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেখানে কোন আশা নাই। আমাদের Art-School গুলিরও এরূপ ভাল অবস্থা নয় যে, সেখানে আমাদের জ্ঞানচর্চ্চা ও ও শিল্পচর্চ্চা একসঙ্গে চলিতে পারে; অতএব আমাদের নিজেদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। পিতামাতা অবস্থাক্রমে না পড়াইতে পারেন তো আমাদের লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; পাঁচ দশ ছাত্রে মিলিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় মনোযোগ দিতে হইবে। শিক্ষাগুরুকে কেবল রেখা-পাত ও বর্ণ সংমিশ্রণের গুরু বলিয়া না জানিয়া সর্ব্ববিষয়ে আমাদের পরামর্শদাতা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। সকল বিদ্যালয়ের মত শিল্পবিদ্যালয়েরও দীর্ঘ দীর্ঘ অবকাশ আছে, সে অবকাশ-কাল কেবল হাত পাকাইতে যাপন

করিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও ঘামাইতে হইবে। একটা ছুটীতে যদি আমাদের পুরাণ কয়খানা পড়িয়া ফেলিতে পারি, তবে সাদা কাগজে গোটা কয়েক তুলির আঁচড় অপেক্ষা আমরা ঢের ফললাভ করিলাম বলিয়া জানিতে হইবে। যদি দেশের এবং বিদেশের শিল্পাদির কতক ইতিহাস চর্চ্চা করি, যদি কিছু না পড়িয়া যাদুঘরটা ঘুরিয়া দেখি,—দেখার মত করিয়া দেখি—তবেও উপকার। মানুষ কল নয় যে, সর্ব্বদা কায করিবে! তাহাকে ভাবিতে হইবে, দেখিতে হইবে, আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে, তবেই তাহার মন সুন্দররূপ গড়িয়া উঠিবে এবং সেই মনের কথা যখন সে চিত্রে, কাব্যে কিম্বা সঙ্গীতে ব্যক্ত করিবে, তখনই তাহা art রূপে প্রকাশিত হইবে।

Art বস্তু যে কি তাহা লিখিয়া বুঝান দুষ্কর, কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই পারিবেও কি না কে জানে। যে artist সেই জানে art কি? মাতৃস্নেহ যেমন লিখিয়া বোঝান যায় না যে উহা কি পদার্থ, তেমনি artও;—দেখিলে চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি, বুঝাইতে গেলেই বাক্য হার মানে। এ art কে পাইবার জন্য আমাদের জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে। কোন গুহাতে শিল্পতত্ত্ব নিহিত আছে, কে জানে? সন্ধানে চল, চারিদিকে চোখ রাখ, হয় তো সে স্পর্শমণি হাতে পাইবে। জীবন কতদিন বলিয়া হতাশ হইলে

চলিবে না,—অনন্ত জীবন পাইয়াছি বলিয়াই এস কার্য্য করি, জ্ঞান উপার্জ্জন করি। জাল পাতিবার আগে হতাশ হইলে স্বর্ণ মৃগ ধরা দেয় না।

স্মরণে মননে ভগবানকে লাভ করা যায়, তবে art পদার্থটাই বা দুষ্প্রাপ্য হইবে কেন? শিল্পীর ধ্রুবলোক যেখানেই থাক, সেখানে যাইবার পথ আছে, এবং সেই পথ জ্ঞানালোকের দ্বারা সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। শিল্প দেবতা নামেও সুকুমার দেখিতেও সুকুমার, কিন্তু তাঁহার আরাধনায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে তাঁহাকে লাভ করিতে হয়,—তিনি বড় কঠিন প্রভু!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শকুন্তলা। ক্ষীরের পুতুল

মনোরম শিশুপাঠ্য সচিত্র পুস্তক। দুইখানি বইই কলা-সম্মত বহু চিত্র ভূষিত, সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। মূল্য প্রত্যেকের ছয় আনা।

রাজকাহিনী

রাজস্থানের ঐতিহাসিক গল্প সমূহ। ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা, কিন্তু বুড়োরাও পড়িয়া আমোদ পাইবেন। ভাষা এমনি সুললিত যে পড়িতে পড়িতে ঘটনাগুলি চোখের সামনে ছবির মত ফুটিয়া উঠে। একখানি নানা রঙে মুদ্রিত ও কয়েকখানি এক রঙের ভালো ছবি আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর করিয়া বাঁধাই। উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী। মূল্য ৸০ বার আনা।

ভারতী—আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। রাজপুতের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ,শৌর্য্য বীর্য্যের ছায়া হৃদয়ে রীতিমত প্রস্ফুট হইয়া উঠে। লেখকের অসাধারণ ক্ষমতা, ছোট কথায়, ছোট একটু ইঙ্গিতে বিপুল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি!

প্রবাসী—গল্পের সকল পাত্র পাত্রীগুলিই জীবন্ত, ভাবে ভঙ্গিতে মনোরম। গল্পগুলির মধ্যে রচনা পারিপাট্য,

চিত্র সৌন্দর্য্য, কাব্যমাধুর্য্য, অপূর্ব্ব উপমা এবং ভাববৈচিত্র একত্র সম্মিলিত হইয়া কেমন একটি অতীত কল্পনালোকের স্বপ্নকুহক রচনা করিয়াছে!

ভারতীয় বিদুষী

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥৵০

ভারতী—সুদূর অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ কাল অবধি ভারতীয় নারী, বিদ্যায় ও জ্ঞানে আপনাকে কিরূপ মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছিলেন—আপনার গৃহধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়াও জ্ঞানে কিরূপে পুরুষের সমকক্ষতা করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রবাসী। বাংলায় নারীপাঠ্য স্বল্প পুস্তকের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে। কন্যা, ভগিনী, পত্নী, সখী প্রভৃতিকে উপহার দিবার যোগ্য—যোগ্য কেন, সকলের উপহার দেওয়া উচিত।

মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি। ভারতীয় বিদুষীদিগের পবিত্র ও উজ্জ্বল চরিত্রের অতি সুন্দর চিত্রাবলী বিশুদ্ধভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরনীয়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গ্রন্থ স্ত্রী-শিক্ষার কাজ এগিয়ে দেবে;—আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা যে নূতন জিনিস নয়, এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে অনেকের চৈতন্য হ'বে।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামান্য উপকরণ হইতে নিপুণ-হস্তে মালা গাঁথিয়া তুলিয়াছ।

BENGALEE—* We are strongly of opinion that for purpose of presentation to our daughters and sisters no better book could be written. It is as instructive as it is entertaining.

জাপানী ফানুস

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত দশখানি বিচিত্র রঙে ছাপা সুন্দর হাফ্‌টোন ছবিযুক্ত জাপান দেশের উপকথার বই। মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে সাতটি সাত রকমের গল্প আছে। ছেলেরা পড়িয়া আমোদ পাইবে, হাসিবে, প্রীত হইবে, কিছু শিখিবে, চিন্তা করিবার মতও কিছু পাইবে। বইখানির চেহারাও এমন সুন্দর যে হাতে পাইলে ছেলেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাপানী ফানুসের রঙিন আলোতে শিশুদের কল্পনাকুঞ্জ প্রমোদিত হয়ে উঠ্‌বে।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—বইখানি কৌতুক, অশ্রু, কল্পনা, লীলা ও হাস্যরসের মিশ্র পরিবেষণ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—পড়তে পড়তে মনে হয় ফানুসের মতই উধাও হয়ে যেন কোন্ স্বপ্ন রাজ্যে উড়ে চলেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ—বর্ণিত চিত্রগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—শিশুর সহিত শিশুর পিতাও ইহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবে।

প্রবাসী—ইহা পাঠ করিয়া ছেলেরা হাসিবে, প্রীত হইবে, কিছু শিখিবে, চিন্তা করিবার মতও কিছু পাইবে।

ভারতী—ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গী এমন হৃদয়গ্রাহী যে তাহা নিমেষেই হৃদয় স্পর্শ করিয়া ফেলে।

বঙ্গদর্শন—অনাবিল আনন্দরসে শিশুহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

নব্যভারত—প্রাঞ্জল ভাষা লিপিকুশলতা বিচিত্র ভাব এবং ঘটনার সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ প্রশংসনীয়।

ভুতুড়ে কাণ্ড

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত পরজগতের বিচিত্র রহস্যপূর্ণ অদ্ভূত ও অলৌকিক সম্বাদ-সম্বলিত পুস্তক ;—ভুতুড়ে কাহিনী ভৌতিক গল্প, মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের কথা, মৃত্যুর পর অবস্থা বর্ণনা বিশদ ভাবে আছে। মূল্য ছয় আনা।

প্রবাসী বলেন—"উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক।"

ভারতী বলেন—"পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না—এমনি বিচিত্র রহস্যপূর্ণ।"

হিতবাদী লাইব্রেরী ৭০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, ও ইণ্ডিয়ান্ পাবলিংশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।